আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার উনচত্বারিংশ গ্রন্থ

পল্লীরাণী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রাবণ, ১৩২৬

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

&
SONS

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

পল্লীরাণী

১

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া অমরনাথ একদিন অপরাহ্ণের স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কনিষ্ঠ সহোদর শৈলেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অমরনাথের দীর্ঘ গৌর-দেহে নবযৌবনের প্রস্ফুটিত অথচ ম্লান মুখোপরি নৈরাশ্যের ও মৃত্যুর কালো ছায়া অলক্ষ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছিল! সে ম্লান বড় বড় কালো চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া গিয়াছিল; সে করুণ কাতর দৃষ্টি আত্মীয়স্বজনের ম্লানমুখে কেন জানি পূর্ব্ব হইতেই একটা নিরাশার ঘন অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছিল।

কাতরকণ্ঠে অমরনাথ ডাকিলেন, "শৈলেন!" শৈলেন্দ্রনাথ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি দাদা! বড় কষ্ট হচ্চে? বাতাস করবো?" শৈলেন্দ্রনাথ এ কথাগুলি একেবারে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন। শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তিনি এতক্ষণ কত কথাই না ভাবিতেছিলেন। অতীত জীবনের কত কথাই না তাহার মানসপটে উদিত হইতেছিল! জ্যেষ্ঠ সহোদর অমরনাথের সেই প্রাণভরা প্রেমভরা স্নেহ—সেই কত যত্ন, কত ভালবাসা; কোন্ দিন

শৈলেন্দ্রনাথ অমরনাথকে মন্দ বলিয়াছিলেন, অমরনাথ তাহা বিশ্বাস করেন নাই!—কোন্ দিন অমরনাথকে মা একটী কমলা লেবু দিয়াছিলেন, শৈলেন তখন বাড়ী ছিল না, অমরনাথ শত অনুরোধেও তাহা খাইলেন না, শৈলেনের জন্য রাখিয়া দিলেন। সেই শৈশবে নদীর তীরে বসিয়া গল্প করা, তারা গণা, ছুটা-ছুটি দৌড়াদৌড়ি,—জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুরবেলা আমতলায় বসিয়া আম কুড়ানো,—অতীত জীবনের,—শৈশবের সেই মধুর কল্পনা-ময়ী স্মৃতি, অতীত ইতিহাস, একে একে ছায়ার মত আসিয়া শৈলেনের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিল। অলক্ষ্যে দুইটা অশ্রু-কণা আসিয়া নয়ন প্রান্তে দেখা দিল। হায়! হায়! এমন স্নেহময়—প্রেমময় পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিয়োগ দুঃখও কি তাহার সহ্য করিতে হইবে? হায়! ভগবান্! এই কি তোমার মনে ছিল? অমরনাথের কাতর আহ্বানে তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন দাদা, কেন ডেকেছেন? আজ কি বড় কষ্ট হচ্চে? বাতাস করবো?"

"না ভাই! আমার কষ্ট কি? আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। নারায়ণ! আমায় ত্রাণ কর, ভাই! আজ আমি তোমায় কয়েকটি কথা বলবো। একবার জানালাটি খুলিয়া দাও! একবার জন্মের মত,—এ দেহে জীবনীশক্তি থাকিতে প্রকৃতির প্রাণভরা হাসি দেখিয়া লই! মা বিশ্বজননী! আমায়

তোমার কোলে নে মা!” ধীরে ধীরে দুই ফোঁটা নয়ন-জল রুগ্নের শীর্ণগণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, দূরে নীলাকাশে ফুলের ন্যায় অনন্ত তারকাগুলি হাসিতেছিল,—সান্ধ্য পবন লতা পল্লব দোলাইয়া—নাচিয়া ছুটিয়া সুরভি কুসুমপুঞ্জ চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল! দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ আকাশে উঁকি মারিতেছিল—সে দৃশ্য বড় করুণ, বড় সুন্দর! রুগ্নের ম্লান মুখে প্রকৃতির হাস্য বিভাষিত মুখখানির রূপোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পড়িয়া এক অপূর্ব্ব প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া অমরনাথ সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় না জানি কত কি ভাবিতেছিলেন! হায়! এ মানবজীবন কি ফুলের মত দুদণ্ড ফুটিয়াই ঝরিয়া পড়ে, না অই আকাশের তারার মত যুগ যুগ নিজের আলো পর-সেবায় বিতরণ করে?

ধীরে অতি ধীরে অমরনাথ শৈলেন্দ্রনাথের হাতখানি স্বীয় শীর্ণ হাতের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন—“ভাই, আমি চলিলাম, আমি বুঝিতে পারিয়াছি আমার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর অধিক সময় নাই,—আমি চলিলাম, —জানি না কোথায় যাইব? ভাই! যদি কোন দিন কোনও অপরাধ করিয়া থাকি মার্জ্জনা করিও, আমি সুখে মরিব। হতভাগিনী বাল বিধবা রহিল, দেখিও উহার জাতি, শীল,

কুলমানের দায়ী তুমি, অভাগিনী যেন কোনও কষ্ট না পায়, অভাগিনীর এ জগতে আর কেহই রহিল না।"

অমরনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,—অজস্রধারে নয়ন-জল ঝরিতে লাগিল! ভ্রাতার মলিন, মৃত্যুকাতর মুখের দিকে চাহিয়া শৈলেন্দ্রনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "না দাদা! উপরে ধর্ম্ম আছেন, আমি জীবিত থাকিতে বৌ-দিদির কোনও কষ্ট হইবে না।" মুমূর্ষুর ম্লান মুখে হাস্যরেখা দেখা দিল। শৈলেন্দ্রনাথ উত্তরীয়-বসনে নয়ন-জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া ম্রিয়মাণা সুষমা।

সুষমা কাঁদিতেছিল,—সংসারজ্ঞানবিরহিতা কোমলা বালিকা জীবনের যৌবনের সেই বাসন্তী ঊষার আশা, সুখ, উৎসাহের প্রীতি পরিবেষ্টনের মধ্যেই ভবিষ্য জীবনের একটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন পরিণাম ভাবিয়া ভাবিয়া নৈরাশ্যসাগরে ভাসিতেছিল।

অমরনাথ ডাকিলেন—"সুষমা!"

সে স্বর শুনিয়া সুষমার অশ্রুপ্রবাহ যেন দ্বিগুণবেগে বহিতে লাগিল। অভাগিনী পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিতেছিল! অমরনাথ আবার ডাকিলেন, "সুষমা, আমার কথা শোন, এ কাঁদিবার সময় নয়, আমার এ জীবনের খেলাধূলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমি চলিলাম,—বড় কষ্ট রহিল তোমায় আমি সুখী করিতে পারিলাম না, জীবনের শত আশা আকাঙ্ক্ষা

সকলি অলীক কল্পনায় পরিণত হইল ! কে জানিত জীবনের শুভ্র প্রভাতেই আমাকে এই কাল ব্যাধি আক্রমণ করিবে ? তুমি হতভাগিনী তাই এ জীবনের সুখসাধ সকলি তোমার অপূর্ণ রহিয়া গেল ; আশীর্ব্বাদ করি জন্মান্তরে সুখী হইও। শৈলেন রহিল তাহাকে আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত দেখিও। সংসারের পথ বড় পিচ্ছিল,—পদে পদে পথভ্রম হইবার সম্ভাবনা, সাবধান ! যেন পদস্খলিত না হয় ! ধর্ম্ম আছেন, ঈশ্বর আছেন, নিরুপায়ের উপায় ভগবান্,—তিনিই তোমার ন্যায় হত-ভাগিনীকে চরণে আশ্রয় দিবেন ;—প্রিয়তমে ! জন্মের মত বিদায় দাও !"— আর কথা বাহির হইল না, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অমরনাথ উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুষমাও গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, অভাগিনীর মুখে আর কথা ফুটিল না !

অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া একজন হাসিতেছিল,—সে সর্ব্বনিয়ন্তা বিভীষিকাময় বিশ্ববিজয়ী মৃত্যু।

২

নিদাঘের এক সুন্দর ম্লান অপরাহ্নে অমরনাথের অমর আত্মা দেহের পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া পলাইল ! হায়, মানব-আত্মার প্রস্থানের পথের যদি কেহ সন্ধান জানিত !

অভাগিনী সুষমা হতভাগ্য স্বামীর মৃত্যুকালীন কাতর রব শয্যাপ্রান্তে পদতলে বসিয়া বসিয়া শুনিল, দেখিয়া শুনিয়া কাঁদিল,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে দেখিল—সে বুঝিল তার এ জন্মের সুখ, শান্তির আশা-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে,—সে চোখের জল মুছিয়া নয়ন মেলিয়া চাহিল,—দেখিল বাহিরে বড় অন্ধকার—অন্ধকারের পর অন্ধকার,—সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল. বাহিরে ভীমা তামসী নিশি। তাহার হৃদয়েও কি তাই? সে অন্তরের অন্তরের দিকে চাহিল, চাহিয়া বুঝিল, এ বাহিরের অন্ধ-কারের শেষ আছে—নিশাবসানে আবার আলোকরেখা দেখা দিবে, জগৎ জাগিবে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্ধকারের পার নাই—কূল নাই—এ জীবনে আর সে অন্ধকারে দামিনী চমকিবে না—চাঁদ হাসিবে না—পাখী আর হৃদয়কুঞ্জে গাহিবে না—সে কোথায়? হায়! হায়! নবযৌবনের পবিত্র উন্মেষে বসন্তের নববিকশিতা ব্রততী অকালে ধূল্যবলুণ্ঠিতা, অকালে দলিতা! সে তাহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল! হায়! হায়! জগদীশ! কেন তাহার এমন হইল? সে যে তখনও আপনাকে ভাল করিয়া বোঝে নাই—সে যে সংসারানভিজ্ঞা কোমলা সরলা বালিকা।

দূরে,—সহসা নদীর তীরে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুষমা সিঁথীর সিন্দূর মুছিয়া ফেলিল—তখনও কপালে সিন্দূর শোভিতে-ছিল,—সে একে একে শরীরের সমুদয় অলঙ্কার খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল, তারপরে পাগলিনীর মত ধূলায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—হায়! হায়! সে যে মণিহারা ফণিনী।

৩

অমরনাথের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, বসন্ত, বরষা, হাসিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছে, বসন্ত হাসিয়াও হতভাগ্য পরিবারের ক্রন্দন থামাইতে পারে নাই, বর্ষাও দিবা-নিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহারও নয়ন-জল মুছাইতে পারে নাই। যে শোক-কাতর তাহার হৃদয়ে শান্তি আসিবে কোথা হইতে? শৈলেন্দ্রনাথ পুরুষমানুষ, তিনি সংসারের দশদিক্ দেখিয়া শোকাবেগ রোধ করিতে অনেকটা সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু সে দারুণ ভ্রাতৃবিয়োগজনিত শোক একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তি প্রেম ও ভালবাসা আছে সে প্রিয়জনের মৃত্যুতে তাহার পবিত্র স্মৃতি ভুলিতে পারে না; —যে ভোলে সে প্রেমিক নহে, তাহার হৃদয়ের ভালবাসার গভীরতা নাই। প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ—মৃত্যু। অভাগিনী

ভ্রাতৃজায়ার এমতাবস্থায় যতদূর সুখ, শান্তি হইতে পারে সে বিষয়ে তিনি সদা সর্ব্বদা যত্ন করিতেন।

জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুকালীন করুণ অনুরোধ বাঁশীর রাগিণীর ন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া দিবানিশি তাহাকে কর্ত্তব্যসাধনে আরও উৎসাহিত করিয়া তুলিত। তিনি সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন। শৈলেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃজায়াকে সংসারের সমুদয় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। সুষমাও দেবরের সংসারের শৃঙ্খলাবিধানে প্রাণপণ যত্ন করিতেন। তাঁহার সচ্চরিত্রতায় ও অমায়িক ব্যবহারে সহজেই তাঁহার প্রতি সকলের স্নেহ ও প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? পিঞ্জরাবদ্ধা বিহগীর সুখ কোথায়? বিহগীর কত কথা মনে জাগে, সে দেখে দলে দলে পাখীগুলি পাখা মেলিয়া মেলিয়া নীলাকাশে উড়িয়া বেড়ায়—বনে বনে শ্যামল পত্রপল্লব পরিশোভিত বিটপী-শাখে বসিয়া বসিয়া গান গায়,—রসাল ফল খায়, কি সুন্দর মুক্ত স্বাধীনতা! সুষমারও ঐ পাখীগুলির মত অমনি করিয়া প্রিয়জনান্বেষণে উড়িয়া বেড়াইবার সাধ যাইত!

তাহার যদি পাখা থাকিত তাহা হইলে সে কি করিত? উড়িয়া পালাইত;—তারার দেশে চাঁদের দেশে যাইত;—সে খুঁজিয়া বাহির করিত কোথায় তাহার জীবনের ধ্রুবতারা।

সুষমা ভাবিত,—ভগবান্ আমায়ও তোমার কোলে টানিয়া লও, এ সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া আর কত দিন এমনি করিয়া জ্বালাইবে? যদি আমাকে সংসারে রাখিতেই তোমার ইচ্ছা ছিল, তবে তাঁহাকে কেন নিলে? যদি তাঁহাকেই নিলে তবে আমাকে রাখিলে কেন? সেই দিন—হায়! হায়! যেদিন অভাগিনীর কপাল পুড়িল,—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ গেল না কেন? আমি মরিলাম না কেন? বাঁচিয়া থাকিয়া আমার ফল কি? আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে সারা জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব?

সে কত কথা ভাবিত—কত কথা চিন্তা করিত—পলকের জন্যও তাহার হৃদয়ে শান্তি ছিল না,—নিশীথ আঁধারে কমলিনী হাসে কবে?

৪

সেদিন শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না বাহিরে হাসিতেছিল। অদূরে কুমারী কূলে কূলে উছলিয়া বহিয়া যাইতেছিল। রজনী হাস্যময়ী। শুভ্র মল্লিকা ফুলের ন্যায় পরিস্ফুট কৌমুদী নদীর ঢেউগুলির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেছিল—খেলিতেছিল—দুলিতেছিল। নদীর তীরে একটী দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার মুক্ত বাতায়ন পাশে বসিয়া একটী রমণী। ধীর সমীরে

মুক্ত কালো কেশগুচ্ছ দুলিতেছিল,—যেন কাল ভুজঙ্গিনী। সে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, চাহিয়া কি দেখিতেছিল? দেখিতেছিল আকাশে তারা, চন্দ্র হাসিতেছে, নদীর জলে সে ছায়া বড় সুন্দর জ্বলিতেছে, যেন শত শত হীরা, মণি। মাঝে মাঝে দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ করিতে করিতে গান গাহিতে গাহিতে মাঝিরা তরী বাহিয়া অনুকূল স্রোতে যাইতেছিল। জ্যোৎস্নালোকে ছোট ছোট তরঙ্গগুলি সেখানে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, পড়িতেছিল,—কোনও সুরসিক প্রবাসগামী নৌকা-যাত্রী বিরহ-সঙ্গীতে ভাবী বিরহ ঘনাইয়া তুলিতেছিল। দূরে,—নদীর পরপারস্থিত আধ আলো, আধ ম্লান, বনরাজি একখানি ঘুমন্ত চিত্রিত চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রকৃতি নৈশ-নীরব-সুপ্ত। জন-কোলাহল কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝোপে ঝাপে ফিস্ ফিস্ সর্ সর্ শব্দ হইতেছে। নিকটস্থ বকুল কুঞ্জের মধুর সৌরভে চারিদিক সুরভিত। সেফালিকা ফুলগুলি শিশির বিধৌত জ্যোৎস্নালোকিত পবিত্রতা মাখা অমল ধবল।

যুবতীর মুখের উপরে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছিল, নক্ষত্র বালিকাগুলি আকাশের গায় মৃদু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া চাঁদের লীলা দেখিতেছিল। চন্দ্ররশ্মি প্রতিফলিত মুখখানি কেমন দেখাইতেছিল? যেন বিরহবিধুরা ম্রিয়মাণা কমল-সুন্দরী;

হাসি ফোটে না,—আপনার ভাবে আপনি বিভোর, বিরস ম্লান।

সুষমা ভাবিতেছে,—তিনি কোথায় গিয়াছেন? যে দেশে গিয়াছেন সে দেশেও কি এমনি করিয়া চাঁদের কিরণে চারিদিক হাসে? সে দেশেও কি এমনি করিয়া ফুল ফোটে? এমনি করিয়াই কি পাপিয়া কোকিল ঝঙ্কার দেয়? এমনি করিয়াই কি মর্ম্মরিত তানে পবন বহিয়া যায়? এখানে যেমন চাঁদ হাসে,—আমি যেমন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছি তিনিও কি এমনি করিয়া সে অজ্ঞাত দেশে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন? আমার মত তিনিও কি আমার কথা ভাবেন? চাঁদ! তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? তুমি কি বলিতে পার না আমার জীবনের জীবন, আমার প্রাণের প্রাণ,—চির ঈপ্সিত, চিরদয়িত তিনি কোথায়? আমায় যেমন দেখিতেছ, তাঁহাকেও কি তেমন দেখিতে পাও না? হ্যাঁ চাঁদ, তিনি কেমন আছেন? প্রাণনাথ আমার কেমন আছেন? বল চাঁদ, বল, বল, ওকি! তুমি হাসিতেছ কেন? হাসিও না —ও কলঙ্কী শশধর হাসিও না,—আমি বড় অভাগিনী তাই কি হাসিতেছ? এ জগতে—এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে তবে কি সত্য সত্যই পরের ব্যথায়—পরের জ্বালায়—কাহারও হৃদয় গলে না? তবে কি সত্য সত্যই এ জগত নির্ম্মম নিঠুর?

চাঁদের কিরণ! তুমি কি সে দেশেও এমনি করিয়া আলোকিত কর? যে দেশে আমার প্রাণেশ্বর আছেন?

ভাই মেঘ! তুমি কোথায় যাও ভাই? দাঁড়াও দু'টো কথা জিজ্ঞাসা করি। একি! কোথা যাও? ধীর পবনে কোথায় যাও? আহা! আমি যদি মেঘ হইতাম, তাহা হইলে জ্যোৎস্নালোকিত দেহে তাঁহার চরণপ্রান্তে উড়িয়া গিয়া লুটিয়া পড়িতাম।

সুষমার কথা মেঘ শুনিল না—সে কোথায় ভাসিয়া গেল! সুষমার কথা চাঁদ শুনিল না,—সে হাসিয়া হাসিয়া কিরণ ঢালিতে লাগিল।

প্রিয়তম! এ জগতে তোমার আমি পূজা করিতে পারি নাই, বড় সাধ যায় তোমায় পূজা করিব। ফুল—না—না—এ সামান্য ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব না,—ফুল যে দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া যায়, দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যায়,—আমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া অম্লান উজ্জ্বল অনন্ত সুন্দর প্রেম-ফুল দিয়া যে তোমায় দিবানিশি পূজা করিতেছি, সে পূজা কি তুমি লইবে না?

৫

সুরপুরের দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে না চিনিত এমন লোক সে অঞ্চলে কেহ ছিল না। তাঁহার মহানুভবতা, দয়ার্দ্র

হৃদয় ও সরল উদার ব্যবহার সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, পরের জন্য, পরের ব্যথায় তাঁহার হৃদয় যেমন কাঁদিয়া উঠিত এমন কাহারও হইত না। সুরপুরের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কত অনাথা, কত নিঃসহায় দীন দুঃখী যে তাঁহার করুণাবারি সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তিনি ধনী ছিলেন না,—অথচ অর্থের অভাবে কখনও পরোপকারের ব্যাঘাত ঘটিত না, কি জানি কোথা হইতে অর্থ জুটিয়া যাইত। আজ কাহারো খাইবার নাই, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, আশা আছে বিশ্বাস আছে সেখানে গেলে মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার স্নেহ কোমল ব্যবহারে শোকার্ত্ত শোক ভুলিত, রোগীর ম্লান মুখে হাসিরেখা প্রতিভাত হইয়া উঠিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণীও আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন, তিনিও প্রত্যেক বিষয়ে পতির সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যে কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি—তদ্দ্বারাই বৎসরের আহার চলিয়াও গোলায় কিঞ্চিৎ মজুত থাকিত, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রূপেও দুই চার পয়সা আয় ছিল, পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ জমাজমি হইতে তাহা আসিত। তাঁহার সংসারে কোন প্রকার অশান্তি ছিল না। সন্তানসন্ততির মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা

নৃত্যকালী অমরনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের বড় ছিল। অমরনাথ শৈলেন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত শিশু, সে সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর সময়ে দেশ জুড়িয়া একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল,—সরল হৃদয় কৃষকগণের করুণ ক্রন্দনে ও দীন দুঃখীর আর্ত্তনাদে চারিদিকে শোকের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বন্য কুসুমের মধুর সৌরভের ন্যায় তাঁহার পুণ্যময় জীবনের পুণ্য সৌরভ কোন্ অদৃশ্য অজানিত শ্যামল বৃক্ষবল্লরী পরিশোভিত পল্লী-গ্রামের বিজন অন্তরালে লুকাইয়া গেল, তাহা কেহ দেখিল না —তাহা কেহ জানিল না। পিতার জীবিতাবস্থায়ই নৃত্যের বিবাহ হইয়াছিল,—বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই নৃত্যের কপাল পুড়িয়াছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সময়ে জীবিত ছিলেন, বড় আদরের, বড় স্নেহের কন্যার অতি শৈশবে—কেবল মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষে এরূপ অবস্থা হইল, ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইয়া পড়িলেন। নৃত্য পিতামাতার প্রথম সন্তান, কাজেই উভয়েরই বড় আদরের ছিল, সে যখন যে আব্দার করিত উভয়েই প্রাণপণে কন্যার তৃপ্তি সাধনের জন্য স্নেহান্ধ হৃদয়ে তাহা করিতেন, ইহাতে নৃত্যের চরিত্র বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার যাহা অভিরুচি হইত সে তাহাই করিয়া বসিত—যদি তাহাতে কেহ নিষেধ বা বাধা দিত তাহা

হইলে সে কোঁদল করিয়া মায়াকান্না কাঁদিয়া সকলকে জ্বালাতন করিত ও নিজের অভীষ্ট সাধনের পন্থা করিয়া লইত।

বাল্যকালে বালকবালিকাগণকে যথোচিত শাসনে না রাখিলে পরে যে কিরূপ বিষময় ফল হইয়া দাঁড়ায় নৃত্য তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। অভাগিনী নৃত্যের কপাল পুড়িবার পর হইতে বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিরপ্রফুল্ল মুখে কেহ হাসি দেখে নাই। কন্যার ভবিষ্য জীবনের শোচনীয় পরিণাম ভাবিতে ভাবিতেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শয্যাশায়ী হইয়া তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণীর সেবা শুশ্রূষা ও প্রতিবেশিগণের চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ করিয়া কালের করাল আহ্বানে সুরপুরের সকলকে কাঁদাইয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। অপোগণ্ড শিশু দুইটীর এক মা ও ভগ্নী ভিন্ন এ জগতে আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। পিতৃহীন শিশু দু'টীর ক্ষীণ কণ্ঠে বাবা! বাবা! রব, প্রাণপ্রিয়তমা পত্নীর করুণ বিলাপ, কন্যার হাহাকার ও দীন দুঃখীর কাতরোক্তি আর কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—কোথায় চলিয়া গেলেন,—কে জানে?

৬

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—শ্রাবণের বারিধারার পর শরতের প্রাণবিমোহন হাসি যেমন লোকের মন মুগ্ধ করে,—তেমনি শোকার্ত্ত পরিবারের শোকান্ধকারের ভিতরে আশার ক্ষীণ আলোকরশ্মি ভবিষ্যতের একখানি শুভ্র স্বর্ণা করোজ্জ্বল আলেখ্য বুকে করিয়া পতি-বিয়োগবিধুরা—বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণীকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দ্বিগুণ বলে উৎসাহিত করিলেন। তিনি কত আশা, কত সুখ-স্বপ্ন বুকে করিয়া স্নেহের নীড়ে সন্তান দু'টীকে আগুলিয়া রাখিয়া শীত-জর্জ্জরিতা ম্রিয়মাণা প্রকৃতি সতীর ন্যায় শুভ বসন্তের আশায় সহিষ্ণুতা সহকারে বিষাদের দিনগুলি কাটাইতেছিলেন। মানব এমনি আশামুগ্ধ!

কন্যা নৃত্যকালী বিধবা হইবার পরে একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কাহারও সঙ্গেই ঐক্য না হওয়ায় পুনরায় পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া সেখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন এবং পাড়ার প্রখ্যাতনামা ঝগড়াপ্রিয়া রমণীগণকে সম্মুখ সমরে প্রকৃত বীরের ন্যায় পরাজিত করিয়া—অটুট গর্ব্বে স্বয়ং শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

মধ্যে একবার তাহার দেবর তাহাকে নিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে সে বেচারী ভ্রাতৃজায়ার বিকট ভ্রূকুটি ভঙ্গী ও তীব্র বচন-বাণে বিদ্ধ হইবার ভয়ে সেই রণরঙ্গিনীর "রণং দেহি" রব শুনিতে শুনিতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিয়াছিল এবং পৈতৃক প্রাণ লইয়া নিরাপদে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে সক্ষম হওয়ায় কালীঘাটের মা কালীকে যোড়া পাঁঠা ও মহিষ মানিয়াছিল। কন্যার বাক্-চাতুর্য্যে ও বীরত্ব হুঙ্কারে সরলহৃদয়া প্রাচীনা বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী ভীতা ও সঙ্কুচিতাবস্থায় দিন কাটাইতেন।

* * সময় কাহারো অপেক্ষা করে না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কাল-সাগরে গড়াইতে লাগিল, সে আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া অমরনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। অমরনাথ পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক ও শৈলেন্দ্রনাথ দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক। অমরনাথ ও শৈলেন্দ্র-নাথ উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধা জননীর ম্লানমুখে আবার বহুদিন পরে হাস্যরেখা দেখা দিয়াছে,—তিনি সন্ধ্যার সময় যখন গৃহস্থিত বারান্দায় মালা জপিতে বসিতেন, যখন চারিদিকে ক্ষীণ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, যখন ঘনপল্লবসমাচ্ছন্ন বিটপিশ্রেণীর ঘনবিন্যস্ত পত্রাবলীর ভিতর দিয়া সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসিয়া কুমারী

তটস্থ তাঁহাদের ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকাখানি ঘিরিয়া ফেলিত, যখন একে একে অসংখ্য তারা আকাশে ফুটিয়া উঠিত,—যখন কুমারীর কল্ কল্ ছল্ ছল্ রবের ভিতর বাঁশীর রাগিণীর মত করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিত—নীড়ে নীড়ে পাখীগুলি ফিরিয়া আসিত—দূরে নদীর পরপারস্থ কৃষক-পল্লীতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিত, ঠিক্ সেই সময়ে সন্ধ্যার সেই স্তব্ধ ম্লান সৌন্দর্য্যের মধ্যে অলক্ষ্যে বর্ষীয়সী বিধবার নয়ন-কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিত ;—নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দূর অতীতের একখানি আমোদ-কোলাহলপূর্ণ উজ্জ্বল আলোক-বিচ্ছুরিত মধুযামিনীর মধু কথা মনে পড়িত,—সেই সে দিন যে দিন তিনি পট্টবস্ত্রপরিহিতা নববধূর বেশে সাদরে অভ্যর্থিতা হইয়াছিলেন—সে প্রাঙ্গণ তেমনি আছে,—সেই বকুল গাছ দুইটিও তেমনি আছে—কিন্তু সেই শুভ উৎসবের দিন আজ কোথায় ?

তারপরে একদিন যৌবনের মধুময় পুণ্যপ্রভাতে,—সেদিন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আর কি জীবনে তাহা ফিরিয়া পাইবেন ? বাহিরে চাঁদ হাসিতেছিল,—ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কোণে বসিয়া তাঁহারা দুইজনে, কক্ষে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে—মুক্ত বাতায়নপথে কুমারী-শীতল-শীকর-সিক্ত নৈশবায়ু সর্ সর্ রবে ঘরে আসিতেছিল, সে মৃদু বায়ু বিকম্পনে ঘরের বাতি দুলিতেছিল—নাচিতেছিল, তাহাদের সুখে হরষিত হইয়া যেন

হাসিতেও ছিল। দুইজনে বসিয়া কত গল্প, কত হাসি, ভবিষ্যতের কত সুখ-কল্পনা করিতেছিলেন—শিশু দু'টী শয্যায় শুইয়াছিল, যেন রবিকিরণোদ্ভাসিত অর্দ্ধবিকশিত কমলকোরক। আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল,—চাঁদের মধুর কিরণ নবনীতকোমল শিশু দু'টীর হাসিমাখা মুখ দু'খানির উপরে পড়িয়া সে সুকুমার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল, চঞ্চল আলোকে—চঞ্চল বাতাসে কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ ধীরে ধীরে কাঁপিতেছিল—পদপ্রান্তে দশমবর্ষীয়া কন্যা নৃত্য মায়ের আঁচল ধরিয়া বালসুলভচপলতাপূর্ণ নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেছিল, সে প্রশ্নের আদি ছিল না অন্ত ছিল না—হরি! হরি! কোথায় সেই দিন? অতীতের স্মৃতি বৃদ্ধার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিত। আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন! না জানি কতই সুখের হইত!

মানবের সুখ ও দুঃখের ভাগ্যবিধাতা ভগবান্। সে বিষয়ে মানুষের কোন হাত নাই। কে জানে বৃদ্ধার এ সুখ-কল্পনার বিরুদ্ধে মহাকাল কি শোচনীয় পরিণাম কল্পনা করিতেছিলেন। মানুষ তাহা জানিতে পারে না বলিয়াই আশায় আশায় দিন কাটায়, যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে কি আর এ অলীক স্বপ্ন-কুহকে আবদ্ধ রহিত? বৃদ্ধা পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দিয়া সুন্দর দু'টী বউ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিবার জন্য ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন এবং অনুরোধ উপরোধের সহিত অল্পবিস্তর অশ্রুজল

মিশাইয়া পুত্রদ্বয়ের অনিচ্ছার ভিত্তিটা নাড়িয়া দিলেন। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল,—অবশেষে রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই করণীয়া দুইটী অলোকসামান্যা সুন্দরী বালিকার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্খধ্বনি ও উলুরবে চারিদিক মুখরিত করিয়া অমরনাথের ও শৈলেন্দ্রনাথের শুভ-উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। বৃদ্ধার বহুদিনের গুপ্ত বাসনা পূর্ণ হইল। কয়েক বৎসর খুব সুখ শান্তিতেই কাটিয়া গেল।

এ জগতে সুখ অতি অল্পকাল স্থায়ী। সুখ যেখানে বাসা বাঁধিয়াছে, দুঃখও সেখানেই বাসা বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই জগতের বিচিত্র রীতি। সুখ একটু উঁকি মারিতেই দুঃখ আসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে দেখা দিল। যে দুইটী স্নেহের পুতলীকে নিয়া দুঃখিনী বৃদ্ধা কত সুখের ঘর বাঁধিতে যাইতেছিলেন, অলক্ষিতে মৃত্যু আসিয়া তাহার একটীকে কক্ষচ্যুত করিল, অমরনাথ অকালে কালকবলিত হইলেন। এত সাধের একটী কুসুম অসময়ে ঝরিয়া পড়িল! বৃদ্ধা জননীর হৃদয়ে শেল বিঁধিল, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। কে জানিত বৃদ্ধার মানস-স্বপ্ন এ শোকগাঁথায় পরিণত হইবে?

৭

বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চারিদিক দগ্ধীভূত করিতেছেন। রৌদ্র-দগ্ধ বসুন্ধরা নীরব ও নিস্পন্দ। কৃষাণেরা কেহ কেহ কর্ম্মক্লান্ত ঘর্ম্মসিক্ত দেহে অদূরস্থ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবনে পরিশ্রম দূর করিতেছে,—কেহ কেহ টকী কিংবা গামছা মাথায় দিয়া ক্ষেতে কাজ করিতেছে, কৃষাণের ছেলেরা গল্প করিতেছে,—ঢিল ছুড়িতেছে—দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। গাভীগুলি এদিকে ওদিকে গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঝোপের আশে পাশে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রোমন্থন করিতেছে, মাঝে মাঝে পুচ্ছ আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে। আকাশ মেঘশূন্য। অনভ্র নীল গগনে বাজপাখী পাখা মেলিয়া মেলিয়া ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ছেলে কাঁখে ও কলসী কাঁখে লইয়া কৃষকের বৌ-ঝিরা স্নান করিতে যাইতেছে, ঘরে ফিরিতেছে—পরিধানে মলিন বস্ত্র—অঙ্গমসীবিনিন্দিত। বিরল-পল্লব গাছের শাখায় বসিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা দয়েল গাহিয়া গাহিয়া থামিয়া যাইতেছে।

নিদাঘের সেই রৌদ্র-দগ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় সুরপুরের একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার ক্ষুদ্র কক্ষে ম্লান শয্যায় শুইয়া শুইয়া

একটী বৃদ্ধা রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিতে-ছিলেন, স্ফুট ক্রন্দনে ও অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সে ব্যথা ও সে যন্ত্রণা আপনা হইতেই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। এতক্ষণ সুষমা পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে বাতাস করিতেছিল,—গায়ে হাত বুলাইতেছিল ও মাছি তাড়াইতেছিল, সে এই মাত্র শ্বাশুড়ীর বার বার অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নান আহার করিতে গমন করিয়াছে। মেজের উপরে রুগ্ন'র অপর পার্শ্বে মাদুরের উপর কেশ এলাইয়া নৃত্য কৃত্রিম নিদ্রায় অভিভূত। বৃদ্ধা রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। একে রৌদ্রের উত্তাপ, তাহাতে আবার জ্বরের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসার যাতনা, তদুপরি নানাবিধ মানসিক যন্ত্রণায় পুত্রশোকাতুরা বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন।

প্রাণের প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হইলে পুরুষের শোক কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রবল থাকে, কিছুদিন পর্য্যন্ত সে শোকানল অমিত তেজে জ্বলে, কিন্তু সময়ের চিকিৎসায়ও ধৈর্য্যবলে পুরুষ তাহা দমন করে, সে শোকব্যথা তাহাদের হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যায়, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় নীরবে গুপ্তভাবে তাহা প্রবাহিত হইতে থাকে সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। কোমলহৃদয়া রমণী তাহা পারে না,

প্রিয়জন-বিরহ, পতিপুত্রের বিয়োগ-শোক-ক্লেশ, তাহাদের বড় বাজে, সে যাতনা—সে বেদনা—আপনা হইতেই বিকশিত হয়। সারা দিবসের কার্য্যশেষে সায়াহ্নের স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে অতীত স্মৃতি তাহাদের হৃদয়-মন্দিরে উত্থিত হইয়া ব্যাকুলিত করিয়া দেয়, নয়ন-জল শাসন মানে না,—নীরব নিশীথে বিশ্রাম-সুখ-লালসায় যখন শয্যায় শয়ন করে, তখন উপাধানে মুখ লুকাইয়া রমণী কাঁদে, বসন্ত বর্ষায় আমোদ প্রমোদের দিনে অলক্ষ্যে তাহাদের চোখের জল পড়ে, প্রভাতে বাঁশীর রাগিণীর মত উচ্চ তানে পাখীর মত গলা ছাড়িয়া ছাড়িয়া যখন ব্যথিতা রমণী কাঁদে, সে কাঁদা বড় করুণ! বড় মর্ম্মস্পর্শী! সে শোক-সঙ্গীতে বুঝি পাষাণও গলে।

হায় রমণী! তুমি কি কেবল কাঁদিতে, কেবল কি সংসারের যন্ত্রণা সহ্য করিতেই জগতে সৃষ্ট হইয়াছ?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "নৃত্য।"

নৃত্য নাসিকা গর্জ্জনে প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বীয় নিদ্রার গভীরত্ব প্রকাশ করিতেছিল। জননীর রোগ-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট কম্পিত কণ্ঠের ক্ষীণ রব তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ লাভ না করিতে পারিয়া অনন্ত প্রবাহিত, তরঙ্গিত বায়ুস্রোতে মিশিয়া গেল।

জননী আবার বলিলেন, "নৃত্য আমায় একটু জল দাও

মা! বড় পিপাসা! বড় জ্বালা! বাবা অমর কোথায় গেলি বাবা!" এ কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে বৃদ্ধার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে ক্ষীণ স্বরে নৃত্যের সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিল না। সে দ্বিগুণ উৎসাহে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

একি করিলে নৃত্য!! যে স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-বারি সিঞ্চনে, যাঁহার স্তন-সুধা পানে আজ তুমি এত বড় হইয়াছ, যাঁহার একবিন্দু স্নেহ-ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই, জগতে কাহারো নাই—সে জননীর হৃদয়ে আজ তুমি কি কষ্ট দিলে! আহা! পতিপুত্রহারা অভাগিনী জননী,—পিপাসাতুরা রোগশয্যায় শায়িতা জননী, আজ তোমার নিকট একটু জল চাহিল, তুমি তাহা শুনিলে না। এতই কি তোমার পরিশ্রম হইয়াছে? এতই কি তুমি দুর্ব্বলা? এই জননীই না বাল্যকালে তোমাকে কত আদর, কত যত্ন করিয়াছেন? হায়! হায়! এই কি তাহার প্রতিশোধ! এই কি তোমার মাতৃস্নেহের পুরস্কার?

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, দেয়াল ধরিয়া বিছানায় ভর করিয়া পড়িতে পড়িতে উঠিলেন, একবার উঠিতে পড়িয়া গেলেন—আবার উঠিলেন—উঠিয়া পার্শ্বস্থিত কলসী হইতে জল ঢালিয়া—জলপাত্র—জলপাত্র মুখের নিকট

নিতে যাইবেন,—সে জল আর মুখে উঠিল না! আর পিপাসা দূর হইল না! শীর্ণ হাত কাঁপিতে লাগিল—কাঁপিতে কাঁপিতে হস্ত হইতে জলপাত্র পড়িয়া চারিদিকে জল ছড়াইয়া গেল—মাথা ঘুরিয়া—চারিদিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বৃদ্ধা জ্ঞানশূন্যা অবস্থায় শয্যায় পতিত হইলেন—ইহজগতে আর তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না!

সে চীৎকার—যেখানে সুষমা স্নান করিয়া সবেমাত্র দুইটী ভাত লইয়া বসিয়াছিল,—সেখানে প্রবেশ করিল, সুষমা তাড়াতাড়ি ভাত ফেলিয়া হস্ত-প্রক্ষালন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া নিদ্রিতা ঠাকুরঝিকে জাগরিতা করা যুক্তিসঙ্গত বোধে 'ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!' রবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল।

৮

ঠাকুরঝির ঘুম ভাঙ্গিল, নয়ন মেলিয়া এলায়িত কেশপাশ বন্ধন করিয়া বিস্রস্ত বসন স্থির করিতে করিতে কর্কশ স্বরে সে কহিল, "দুর্গা! দুর্গা! একটু আরামে ঘুমুবার যো নেই, যেন বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে! কি হয়েছে বল ত বৌ!"

সুষমা অতি মৃদুস্বরে কহিল, "দেখুন ত মা ও রকম ভাবে

পড়ে রইলেন কেন, রোগা দুর্ব্বল মানুষ বড় ভয় হচ্চে!" নৃত্য ঘৃণাভরে মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল, "বুড়ী মাগীর ন্যাকামো দেখ!" সুষমা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর নাকে মুখে হাত দিয়া তাহার নিস্পন্দ শরীর দেখিয়া ব্যাকুলভাবে করুণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি! তাড়াতাড়ি ঠাকুরপোকে ডাকুন, বুঝি মা আর বাঁচিয়া নাই!" নৃত্য এইবার চমকিত হইয়া দ্রুতপদে বাহিরের ঘর হইতে শৈলেনকে ডাকিয়া আনিল। শৈলেন সারারাত্রি জাগিয়া পীড়িতা জননীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মধ্যাহ্নে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সে ভগিনীর আকস্মিক আহ্বানে দ্রুত বাড়ীর ভিতর রুগ্না জননীর শয়নকক্ষে আসিয়া মায়ের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর দ্রুতপদে কবিরাজকে আনয়ন করিবার জন্য চলিয়া গেল—কবিরাজ আসিলেন—বহুক্ষণ নানা ভাবে পীড়িতার নাড়ী দেখিলেন—তারপর হতাশভাবে কহিলেন, "সহসা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ হইয়াছে।" ধীরে ধীরে ম্লানমুখে কবিরাজ মহাশয় স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। এদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। নৃত্যই নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে মাতার গুণ বর্ণনা করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—মাতার মৃত্যুতে যে তাহার সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন হইল—এ কথাই সে বিনাইয়া বিনাইয়া প্রচার করিতে লাগিল—পাড়ার মেয়েরা

তাহার এইরূপ মায়াকান্না শুনিয়া সম্মুখে সহানুভূতি জানাইলেও নেপথ্যে বলাবলি করিতে লাগিল যে—"এমন দেবীর মত জননীকে জীবিতকালে নানা জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে দগ্ধে মেরেছে, আর এখন 'মায়াকান্না' দেখ।"

ধীরে ধীরে সব ফুরাইয়া গেল। আবার কুমারীর তীরে চিতার আগুন জ্বলিল—দেখিতে দেখিতে বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণীর পাঞ্চভৌতিক দেহ মাটিতে মিশিয়া গেল। শৈলেন ধীর স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে মাতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিল। এতদিনে সুষমা সত্য সত্যই মাতৃহীনা হইল—তাহাকে আর আদর যত্ন করিবার কেহই রহিল না। আর শৈলেন্দ্রনাথ -পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয় যুবক—একাকী সংসারের সঙ্গে এখন তাহার যুঝিতে হইবে। যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল,—প্রাচীন স্মৃতি চিরবিলুপ্ত হইল।

৯

এ সংসারে বিধাতার বিধান একটু বিচিত্র রকমের। শোক, দুঃখ যাহাই হউক না কেন তোমাকে সকলের আগে উদর নামক পদার্থটীকে পূর্ণ করিবার জন্য খাটিতে হইবে। তাহার পীড়নে শোক ভুলিতে হইবে, কর্ম্মক্ষেত্রে নাবিতে হইবে, তুমি আর কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিবে? খাটিতেই হইবে—

উদর আছে বলিয়াই—ক্ষুধার পীড়ন আছে বলিয়াই তোমার কর্ম্মের প্রয়োজন। মানুষ এই উদরের পীড়ন—উদরের জ্বালা আছে বলিয়াই সময়ে শোক ভুলিয়া যায়। না ভুলিয়া তাহার উপায় নাই।

পঞ্চাশ বৎসর আগে পল্লীগ্রামের লোকের যে সহজ সরল জীবন-যাত্রা ছিল এখন আর তাহা নাই। একদিকে যেমন পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-সুখ চলিয়া গিয়াছে, তেমনি খাদ্য দ্রব্যাদির সুযোগ সুবিধাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সে দুধ, মাছ, ঘৃত আর এখন মিলে না, ক্ষেতে আর তেমন ফসল ফলে না, নদী শুকাইয়া গিয়াছে, পুকুর হাজিয়া বুজিয়া যাইতেছে, ম্যালেরিয়া রাক্ষসী মুখ বিস্তার করিয়া চারিদিক গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত। ওলাউঠা, জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি নানা রোগের ত কথাই নাই। আগে পল্লীগ্রামে এ সকল জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না, তখনকার লোকের অটুট স্বাস্থ্য ছিল, মনের বল ছিল, সকলের উপর প্রীতি ও একতা ছিল, পরস্পরে পরস্পরের সহায়তা করিত, আমোদে-আহ্লাদে বিপদে শোকে এক প্রাণে সহানুভূতি প্রদর্শন করিত—এখন আর সেদিন নাই। এখন ঝগড়া—কলহ—দলাদলি সে যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেশে থাকিয়া যে ভাবে সংসার পরিচালনা করিতেন, যেরূপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাইতেন—বিদ্বান শৈলেন্দ্রনাথের পক্ষেও

পল্লীতে তাহা সুদুর্লভ। সংসারটি ছোটখাট হইলেও সমাজে দশজনের একজন হইয়া থাকিতে হইলে বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন। শোকে অভিভূত হইয়া কত কাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে? তাই চারিদিক গুছাইয়া—অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিলি ব্যবস্থা করিয়া শৈলেন্দ্রনাথ বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রামচরণবাবু শৈলেন্দ্রনাথের শ্বশুর। তিনি রেলের কর্ম্মচারী। বহুদিনের পুরাণ লোক—বড় সাহেবকে ধরিয়া জামাতার জন্য একটা বড় দরের কেরাণীগিরি স্থির করিয়া তথায় যাইতে পত্র দিয়াছিলেন। বি-এ পাশ করিয়া কেরাণীগিরির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকিলেও উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় শৈলেন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মতি জানাইয়া শ্বশুরকে পত্র দিয়াছিলেন। শীঘ্রই সেখানে যাওয়া দরকার, নতুবা চাকরীটি হাতছাড়া হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে রামচরণবাবুর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ সুবিধা না হওয়ায় নিজ অধ্যবসায় বলে এত দূর দেশে আসিয়া তিনি স্বীয় চেষ্টা যত্ন গুণে সামান্য কেরাণীর পদ হইতে আজ একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। সংসারে তাঁহার একটীমাত্র কন্যা। পত্নী সারদাসুন্দরী বহুদিন হইল পরলোক-গমন করিয়াছেন—রামচরণবাবু আর দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন

নাই। বিধবা ভগ্নী কমলকামিনীই তাহার সংসারের একমাত্র কর্ত্রী। কমলকামিনী একটী কন্যা ও পুত্র লইয়া বিধবা হইয়া ভ্রাতার সংসারে আইসে। এক্ষণে সেই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কমলকামিনীর পুত্র—ধীরেন্দ্রনাথ রেলওয়ে আফিসে সামান্য বেতনে কাজ করে—বয়স বাইশ তেইশ—সংসর্গদোষে তার নেশাটা ভাঙ্গটা বেশ চলে। থিয়েটারের মস্ত পাণ্ডা। টেরী কাটিয়া—ছড়ি ঘুরাইয়া সময় সময় কুস্থানে ঘুরিতেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, পথে ঘাটে ঘাগ্‌রী-পরা পল্লী রমণীদের জলের কলসী মাথায় ঘরে ফিরিবার সময় সে কুৎসিত কটাক্ষ করিতেও ছাড়ে না! কন্যা—অমলার বিবাহ হইয়াছে—সে হুগলী জেলায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকে, তাহার স্বামীও দেশে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তি দেখে।

শৈলেন্দ্রের পত্নীর নাম নিরুপমা। নিরুপমা বিবাহের পর মাত্র দুইবার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। তারপর সে এত শোক দুঃখের মধ্যেও আর শ্বশুরবাড়ী যায় নাই—তাহাকে নেওয়ার জন্য তেমন আগ্রহ যত্নও বড় একটা কাহারো ছিল না—তাহার কারণ নিরুপমা সংসারের কাজকর্ম্ম বড় একটা জানিত না, আর রামচরণবাবুও একমাত্র কন্যাকে কাছছাড়া করিয়া বেশীদিন থাকিতে পারিতেন না। কাজেই নিরুপমার স্বামীর সহিত ও শ্বশুরবাড়ীর সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাঁধিয়া উঠে নাই।

নিরুপমাকে আধুনিক রূপে শিক্ষিতা করিতে রামচরণবাবু চেষ্টা যত্নের কোনও ত্রুটি করেন নাই—সে ভালরূপ বাজাইতে গাহিতে ও লিখিতে পড়িতে পারিত। হারমোনিয়াম ও এস্রাজ বাজনায় তাহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। নিরুপমা—সুন্দরী—অষ্টাদশী। শরতের জ্যোছনার মত তাহার অঙ্গের বরণ শুভ্র না হইলেও—সে গৌরাঙ্গী, তন্বী, দেহসৌষ্ঠব অতি সুন্দর, তাহার সুদীর্ঘ কেশপাশ বস্তুতঃই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। নিরুপমার স্নিগ্ধ সজল ঢল ঢল কালো দুইটী চপল আঁখির সচকিত চাহনি অনেককেই মুগ্ধ করিত। প্রথম প্রথম বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য তাহার তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়বার যাইয়া স্বামীর অগাধ প্রেম ও আদর লাভ করিয়া ও শ্বাশুড়ীজায়ের যত্নে ও মমতায় সেবার সুরপুর ছাড়িয়া আসিতে সে বস্তুতঃই কষ্ট বোধ করিয়াছিল। কিন্তু তারপর দীর্ঘ পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ আর সেখানে যাইবার জন্য কোনও তাড়া বা আবদার না আসায় তাহার মনও বিমুখ হইয়া আসিয়াছিল। শৈলেন্দ্রনাথ উদাসীন প্রকৃতির লোক,—তারপর অনবরত শোকের ঝড়-ঝঞ্ঝা তাহার মাথার উপর বহিয়া যাওয়ায় পৃথিবীর আনন্দ, প্রেম ও উৎসাহ লোপ পাইয়াছিল—সংসারের সরল সুন্দর প্রফুল্ল দিকটা বিস্মৃত হইয়া—সে শোকের বিষাদের ও হতাশের বিভীষিকা চিত্র বুকে করিয়া—হৃদয় হইতে প্রণয় ও

আনন্দ ভুলিয়া গিয়াছিল—সংসার তাহার নিকট শ্মশানসদৃশ বিবেচিত হইত, সে যাহা কিছু করিত তাহাও কর্ত্তব্যের প্রেরণায়। তবু তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে ফল্গুনদীর স্নিগ্ধ ধারার ন্যায় যে স্নেহকোমল প্রীতির ধারা নিয়ত উৎসারিত হইত বাহির হইতে তাহা বোঝা বড় সহজ ছিল না। এজন্য সাধারণের নিকট সে সামাজিক বা মিশুক বলিয়া আদর পাইত না, লোকে গুরুগম্ভীর ধীরপ্রকৃতির এই যুবকটিকে দূর হইতে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত, কিন্তু কেহই বড় একটা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে চাহিত না।

রামচরণবাবু জামাতার জন্য একটী উচ্চপদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, শিক্ষানবিশী সময়েই সে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাইবে, তৎপর একশত টাকা বেতন হইতে ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইবে। জামাতার এই চাকরীটি স্থির করিয়া দিতে পারায় তাহার একটু আনন্দও হইয়াছিল—শেষ বয়সে কন্যা ও জামাতা একস্থানে থাকিবে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে কোলে কাঁখে করিয়া জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দিবেন ইহাই তাহার ছিল গোপন অভিপ্রায়। শ্বশুরের কাছে থাকিয়া তাহারি গৃহে বাস করিয়া কাজকর্ম্ম করিতে শৈলেনের বড় একটা আগ্রহ ছিল না,—কিন্তু সময়ের দোষে অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহার যে আর গত্যন্তর নাই। অগত্যা বন্ধুবান্ধবদের সহিত

পরামর্শ করিয়া—শ্বশুরের নির্দ্দিষ্ট এই কার্য্য লওয়াই স্থির হইল। নিরুপমাকে বাড়ীতে না রাখিয়া গেলে লোকে কি বলিবে? বিধবা ভ্রাতৃজায়ার মনেই বা কি লইবে, এ সব নানা কথাই তাহার মনে হইতেছিল,—সুষমা দেবরের এই ভাবটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সে আপনা হইতেই শৈলেনকে কহিল—"ঠাকুরপো! বৌকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইও না যেন! ছুটির সময় যখন দেশে আস্‌বে তখন নিয়ে এস।" শৈলেন ইহার কোনও প্রতিবাদ করিতে যাইবার পূর্ব্বেই সুষমা পুনরায় কহিল—"না—না তুমি কোন শঙ্কা—কোন লজ্জা করো না ঠাকুরপো! ঠাকুরঝি আর আমি খুব থাক্‌তে পারবো—কোন অসুবিধা হবে না, তুমি যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলে এতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আশীর্ব্বাদ কচ্চি ঠাকুরপো! তোমার আয়ু ও যশঃ বাড়ুক—আবার আমাদের বাড়ী ধনধান্যে পূর্ণ হউক।"

গ্রামের দশজনের কাছে বাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখিতে ও তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়া বৃদ্ধ গুরুজন, দিদি ও ভ্রাতৃবধূর পদবন্দনা করিয়া—ভৃত্য দুঃখিয়াকে বিশেষরূপ সতর্কভাবে বাড়ীর তত্ত্বাবধানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া—শৈলেন্দ্রনাথ জীবিকান্বেষণে লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন। নৃত্যকালী, ভ্রাতা রওয়ানা হইয়া গেলে ক্রোধ ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে সুষমাকে কহিল—"দেখ্‌বি

বৌ এবার শৈলেন আর এক মানুষ হবে।" সুষমা কহিল—"অসম্ভব ঠাকুরঝি! ঠাকুরপো! মানুষ নয় দেবতা।" "দেখা যাবে বৌ কার কথা সত্য হয়।" "আচ্ছা দেখো!" বলিয়া সে গর্ব্বিত তেজঃপূর্ণ কটাক্ষ করিল।

নৃত্য ও সুষমা দুইজনের একসঙ্গে এই প্রথম ঘরকন্না আরম্ভ হইল।

১০

শৈলেন্দ্রের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে প্রাণের তারে একটা বিষম বেদনা বাজিয়া উঠিতেছিল। কত কাল পরে সে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে—বাল্যের কৈশোরের ও যৌবনের লীলাভূমি—পিতামাতা ভ্রাতার শ্মশানভূমি—চির আদরিণী জন্মভূমি ছাড়িয়া,—আজ সে দূর বিদেশে অর্থের সন্ধানে চলিয়াছে, তবু—তবু প্রাণ বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে কেন? যাহারা দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে বাস করেন তাহাদের পক্ষে দেশ ছাড়িয়া যাইতে বড়ই কষ্ট হয়। বাড়ীর গাছগুলো—দেশের খোলা মাঠ, ঘর বাড়ী একে একে পশ্চাতে মিলাইয়া গেল—যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল সে একলক্ষ্যে গ্রামের অস্পষ্ট ছায়ার মত তরুশ্রেণী দেখিতে লাগিল। একখানা নৌকা হইতে কে যেন ভাবিয়ালি সুরে গাহিতেছিল—

"বিদেশে যাইওনারে প্রাণ (শ্যাম)
বিদেশে টাকা দিয়ে কে করে দালান,
বিদেশেতে গেলে তুমি উদাসিনী হব আমি
বিদেশী লোকে তোমায় বল্‌বে বেইমান।"

এ গানের সুর ও শব্দ কয়টি তাহার প্রাণে একটা নিরাশার হাহাকার জাগাইয়া দিতেছিল। এত দুঃখের মধ্যেও দীর্ঘকাল পরে পত্নীর সহিত মিলিত হইবার আশায় তাহার প্রাণে আশা ও আনন্দ উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। কত দিন কত কাল পরে পতি ও পত্নীর সম্ভাষণ হইবে—মিলন হইবে। যৌবনের প্রীতি ও আনন্দ যাহা সে এতদিন উপভোগ করিবার অবকাশ পায় নাই, এতদিন পরে সে শুভদিন উপস্থিত—এইরূপ দুঃখ ও আনন্দের পুলকান্দোলনের মধ্য দিয়া সে ধীরে ধীরে যাত্রা-পথে অগ্রসর হইল—ও তিন দিন পরে লক্ষ্ণৌ যাইয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেসনে শ্বশুরমহাশয় আদরে জামাতাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন ও মৌখিক মধুর ভাষে নানারূপ ক্লেশের ও দুঃখের জন্য সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। বিদেশে—সর্ব্বপ্রথম এইরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাইয়া শৈলেনের চিত্ত ভরিয়া উঠিল—সে ভাবিল তাহার দিনগুলি ভাল ভাবেই বোধ হয় যাইবে। সে বাড়ীতে ঢুকিবামাত্রই—কমলকামিনী কহিলেন—"এস বাবা! এস, তবু যে এতদিন পরে আমাদের মনে পড়েছে। ওরে

রামধনিয়া বাবুর হাত মুখ ধোয়ার জল দে! কাপড় জামা ছাড়, স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে একটু সুস্থ হও। ধীরেন, তোদের জামাইবাবুকে উপরে নিয়ে যা।" কমলমণি সাংসারিক কর্ম্মের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। ধীরেন শৈলেনের সহিত উপরের ঘরের দিকেচলিল। নিরুপমা কৌতুহলপূর্ণ নেত্রে উপরের জানালা খুলিয়া শৈলেনকে দেখিতেছিল। শৈলেনের উৎসুক চক্ষুও সে দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ ছাড়িয়া দেয় নাই। রামচরণবাবু ষ্টেসনের অদূরে নিজের অর্থব্যয়ে প্রায় দশবিঘা জমি লইয়া একটা বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। নানাবিধ ফল ও ফুলের বাগান। বাস করিবার পক্ষে যতদূর সাধ্য সুখ সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাড়ীটি নির্ম্মিত। এত বড় বাড়ীতে যে কয়টী লোকের বাস তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ধীরেন শৈলেনকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেল এবং কহিল, "জামাইবাবু! এ আপনার বস্‌বার ঘর—আর সব বুঝতে পাচ্ছেন—মামাবাবু আর নিরুই সব ঠিক্ করে দেবে! আপনারই ত সব মশাই, বুঝ্‌লেন! আমি বড় tired জামাই-বাবু, কাল বুঝ্‌লেন আমাদের রিহার্শেল ছিল—এখানে আমাদের বাঙ্গালীদের একটা ক্লাব আছে,—সেখানে লাইব্রেরী আছে, থিয়েটারের stage আছে, বুঝ্‌লেন, উঃ আমার চোখ জ্বালা

কচ্ছে—যাই, ভাল কথা আপনি smoke করেন?” শৈলেন কহিল—“না!”

ধীরেন সিগারেট ধরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল “উঃ আপনি একবারে নিরামিষ বৈষ্ণব! all right সব হবে জামাইবাবু, দলে মিশে যাবেন। কত কি দেখলুম! আচ্ছা যাই ভাই—বড় tired বুঝ্‌লেন! এও রামধনিয়া ইধার আও।” ধীরেনের মুখ হইতে তখনও মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল, সে চলিয়া গেলে শৈলেন্দ্রনাথ একটু আশ্চর্য্য হইলেন! একে? কই, পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই? এ বাড়ীর নৈতিক হাওয়া কি এই রকম নাকি?

নিরুপমা সুযোগ খুঁজিতেছিল—কিন্তু হতভাগা ধীরেনটা যে কোন রকমেই উঠিতেছে না। ধীরেন চলিয়া যাইবামাত্র—নিরুপমা সারাদেহ আবৃত করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া আসিয়া একেবারে হঠাৎ ঢিপ্‌ করিয়া শৈলেনকে প্রণাম করিল। শৈলেন এ ব্যাপারের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না,—সেও মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া নিরুপমার হাত দু'খানা ধরিয়া আকুল আবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ওষ্ঠে ও ললাটে গাঢ় চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। নিরুপমা—রূপবতী গুণবতী ও সাধ্বী সতী—সে দীর্ঘকাল পতির সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় অন্তর মধ্যে বিশেষ করিয়াই ক্লেশ বোধ করিতেছিল—

কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলে নাই কিংবা স্বামীকেও লিখিয়া জানায় নাই। শৈলেন মাঝে মাঝে তাহাকে তাহাদের পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা লিখিয়া জানাইত; এ সময়ে যে তাহাকে লইয়া আসার কোনও সুযোগ সুবিধা নাই বা হইতে পারে না তাহা সে পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া লিখিয়া জানাইতে ভোলে নাই। নিরুপমা কোন দিকেই কোনরূপ জেদ করে নাই—একদিন না একদিন বিধাতা তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেনই,—এতদিন পরে বিধাতা সে শুভ সময় উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার হৃদয় আনন্দ জোয়ারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—আজ সে পূর্ণকাম। ধীরেনের বিচিত্র ব্যবহারটা স্বামী কি ভাবে গ্রহণ করিলেন এটাও যে তাহার মনে না হইতেছিল তাহা নহে। বহুদিন পরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া শৈলেন মুগ্ধ হইল। তাহার নীরস চিত্তও সরস হইয়া উঠিল। মরু হৃদয় মধ্যে সহসা বসন্তের অভ্যুদয় হইল—উতলা দখিণা বাতাস বহিয়া গেল।

প্রথম দিনের দর্শনে প্রথম মুহূর্ত্তে আর বেশী কথা হইল না। শৈলেন ধীরে ধীরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল এবং গুণবতী পত্নীর রূপে ও গুণে সংসারকে পূর্ব্বে সে যে চক্ষে দেখিত সে ভাব রহিল না, কে যেন তপ্ত ধূলিময় শ্মশানসদৃশ মরুভূমির উপরে নয়ন মন মোহকর সবুজ সুন্দর উপবনের সৃষ্টি করিল।

সেখানে শুধু গান, শুধু হাসি আর অফুরন্ত প্রফুল্ল যৌবনভরা আনন্দ উচ্ছ্বাস। স্বামী স্ত্রী দুইজনেই দুই জনের মন বুঝিলেন—উভয়ের প্রাণের নূতন উৎসাহ ও নূতন আনন্দ দেখিয়া রামচরণ বাবুর প্রাণে ও দেহে যেন যৌবনের প্রদীপ্ত সাহস ও বীর্য্য ফিরিয়া আসিল—এ মিলন—এ আনন্দ কিন্তু সকলের চক্ষে ভাল লাগিতেছিল না।

১১

কমলকামিনীর কাছে রামচরণবাবু যখন শৈলেনের চাকরী সম্বন্ধে ও তাহাকে এখানে আনয়ন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ততটা মত দেয় নাই, জামাই আবার কবে আপনার হয়? আর যে জামাই পাঁচ বৎসরের মধ্যে মেয়ের একটা সন্ধান পর্য্যন্ত লইল না তাহার জন্য অত ব্যস্তই বা কেন? তাই সে বলিয়াছিল—'দাদা! জামাইয়ের জন্য কিছু করতে যেও না, মন পাবে না, আর নিরুকে যে ভুলে রইল, তার নামও মুখে এন না, আহাহা! বাছার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়।' এ কথা কয়টী বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া অনেক খানি জল পড়িয়াছিল। সংসারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা মানব-চরিত্র জিনিসটা বেশ ভাল করিয়াই জানেন, কিন্তু চক্ষু লজ্জাবশতঃ লোকের মুখের

সাম্‌নে কোন কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন,—রামচরণবাবু সেই প্রকৃতির লোক—সাদা কথায় 'বম্ ভোলানাথ!' সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে স্ত্রীবিয়োগের পর আর বড় একটা লক্ষ্য ছিল না—বাড়ী ঘর যা কিছু সবই সতী লক্ষ্মীর কৃপায় ও সাংসারিক শৃঙ্খলতা গুণে হইয়াছিল। এখন পরিণত বয়সে তাঁহার আর বাহিরের দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। সময় মত আফিসের কাজকর্ম্মটুকু সারিয়া আসিলা, সন্ধ্যা পূজা লইয়াই থাকিতেন। সংসারের ব্যয় ইত্যাদির ভার ভগিনী কমলকামিনীর উপরই ন্যস্ত ছিল। ভাগিনেয়ীর বিবাহও তিনিই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দিয়াছেন। ভাগিনেয় ধীরেনকে মানুষ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াও তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারেন নাই,—অগত্যা রেলওয়ের গুড্‌স আফিসে কুড়ি টাকা বেতনের একটী কেরাণীগিরি লওয়াইয়া দিয়াছেন। কমল ইহাতে ভ্রাতার উপর মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য পুত্রকে কিনা দাদার এ রকম একটা সামান্য চাকরীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, আর জামাইয়ের জন্য ভাল চাকরীর ব্যবস্থা! পরের জন্য বাঁদীর মত খাটিয়া যে কোন লাভ নেই, এ ব্যাপারেই ত তাহা বেশ ভালরূপ প্রকাশ পাইল। রামবাবু ভগিনীর ও ভাগিনেয় বাবাজীর অন্তরের এ সব বিষ-বহ্নির সন্ধান জানিতেন কিন্তু তবু কোন কথা বলেন নাই,—

যাহাদিগকে ফেলিবার উপায় নাই তাহাদিগের উপর কঠোর হইয়া লাভ কি ? অযোগ্য ব্যক্তিরাই হিংসা ও দ্বেষের বশীভূত হয়। তারপর যখন সত্য সত্যই শৈলেন আসিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, সত্য সত্যই শ্বশুরগৃহে বাস করিতে লাগিল তখন ধীরেন ও তাহার মাতার প্রাণে হিংসার আগুন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বুদ্ধিমতী কমলকামিনী বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ধীরেনের কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইত। নিরুপমা হতভাগা ধীরেনটাকে দু'চক্ষের কোণেও দেখিতে পারিত না, প্রকাশ্যে কিন্তু তাহা কোনরূপেই প্রকাশ পাইত না। এইরূপ ভাবে একটী বৎসর চলিয়া গেল। শৈলেন নিয়মিত সময়ে আফিসে যাইত, তারপর বসিবার ঘরে, স্বামী স্ত্রীতে বসিয়া বিবিধ নির্দ্দোষ আমোদে প্রমোদে সময় কাটাইত, কখনও সাহিত্যচর্চ্চা হইত, কখনও গান বাজনা চলিত—কখনও নিরুপমার সহিত হাস্য কৌতুক চলিত! বাহিরে যে একটা পৃথিবী আছে—বাহিরের যে একটা কর্ম্মময় জগৎ আছে—সমাজ আছে—সে সব দিকে শৈলেনের কোনও লক্ষ্য ছিল না—আর নিরুপমা সে ত স্বামি-প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। এমন রূপবান্ গুণবান্ বিদ্বান্ সৎস্বভাবাপন্ন স্বামী কাহার আছে? এমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে কয়জনে পারে? নিরুপমা স্বামীর

সুখ শান্তির জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিত। নিজে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়া নিজ হাতে আফিসের পোষাক পরাইয়া এমন কি জুতা জোড়া পরাইয়া ফিতা বাঁধিয়া দেওয়াটাকেও সে লজ্জা মনে করিত না। যে এমন করিয়া সূর্য্যমুখী ফুলের মত এক লক্ষ্যে একই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে তাহাকে ভাল না বাসিয়া কে থাকিতে পারে? ভাবপ্রবণ শৈলেনের উপলাহত রুদ্ধ প্রস্রবণের মত প্রেম উৎস সহসা মুক্তি পাইয়া বিপুলানন্দে উছলিয়া পড়িতেছিল। নিরুপমা সে পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়া পুণ্যে পবিত্রতায় ও মহত্ত্বে প্রকৃত মহীয়সী প্রেম-প্রতিমারূপে প্রতীয়মানা হইয়াছিল। এমনি করিয়াই দুইজনের প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হইতেছিল। এতটা বাড়াবাড়ি কমলকামিনীর কাছে ভাল লাগিত না। তিনি আড়াল হইতে আড়ি পাতিয়া স্বামীস্ত্রীর এইরূপ প্রীতি ও প্রণয় দেখিয়া ঈর্ষ্যা ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন। তাহাদেরও ত যৌবন ছিল—এমন করিয়া ত স্বামী ভালবাসেন নাই। সবই বিচিত্র! সবই অদ্ভুত! ইতিমধ্যে শৈলেনের বেতনও দেড়শত টাকা হইয়াছে, বড় সাহেব এই যুবকের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছেন এবং একরূপ তাহাকে তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ জ্ঞান করেন। সাধারণতঃ রেল আফিসে ভাল লেখাপড়া জানা লোক বড় একটা আইসে না, এরূপ স্থলে শৈলেনের ন্যায় একজন উচ্চ-

শিক্ষিত ব্যক্তির যে সহজেই উন্নতি হইবে তাহা স্বাভাবিক। এই সকল নানা কারণেই উহাদের মনে হিংসার আগুন প্রবল বেগে জ্বলিতেছিল। ইতিমধ্যে শৈলেন্দ্রনাথের একটী পুত্রও জন্মিয়াছে —রামচরণবাবু এখন দৌহিত্রের মুখ দেখিয়া সংসারকে অন্য-ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার যাহাতে বাড়ী ঘরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়—তাহার একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারীর কোন ক্লেশ না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কাজেই একই বাড়ীতে একদিকে আনন্দ এবং অপর দিকে নিরানন্দ ও হিংসার দাবানল জ্বলিতেছিল।

১২

কোথায় ধীরেন মাতুলের সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে তাহা না হইয়া কিনা কে একজন পর আসিয়া ধীরে ধীরে সব জুড়িয়া বসিল। কমলের প্রাণে নিরুপমার পুত্র হইবার পর হইতেই হিংসার আগুনটা তুষানলের মত ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল—কেবল ভালরূপ ইন্ধন পাইতেছিল না। উপকারের পরিবর্ত্তে উপকার বা কৃতজ্ঞতা জগতে অতি বিরল। কমলকামিনী ভ্রাতার সংসারে লালিত-পালিত হইয়াও হিংসার জ্বালা হইতে মুক্তি পায় নাই। যেদিন হইতে শৈলেন্দ্র আসিয়া এই সংসারের একজন হইয়াছে সেদিন হইতেই কমল-

কামিনীর স্নেহমমতা দূরে চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! ধীরেন যে ভাসিয়া চলিল। কেমন করিয়া সুখের সংসারে আগুন লাগে—কেমন করিয়া নিরুপমার সর্ব্বনাশ হয় এই চিন্তাই দিবারাত্রি তাহার চিত্তপটে বিরাজ করিত। নিরুপমা এ সব খুঁটিনাটির দিকে আদৌ কোন লক্ষ্য রাখিত না।

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া রাস্তার ধূলা ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। ধীরেন পার্ব্বতী বাইয়ের বাড়ী হইতে নেশায় মস্‌গুল হইয়া টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিতেছে—এইরূপ মত্ত অবস্থায় সে সপ্তাহে প্রায় দু'দিনই বাড়ী ফিরিত,—কমলকামিনী রাত্রি জাগিয়া গুণধর পুত্রের জন্য বসিয়া থাকিত; দরজায় একটা ঘা পড়িবামাত্রই দরজা খুলিয়া দিতেন। ভয়—পাছে বাড়ীর লোকের কাছে কথাটা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? কথাটা চারিদিকে কাহারো অজানা ছিল না। রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে—ধীরেন টলিতে টলিতে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। কমলকামিনী জাগিয়াছিলেন, দরজা খুলিয়া দিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে ঢুকিয়া—বিছানায় পড়িয়াই ধীরেন সুর ধরিল—"তারে দিয়েছিলাম দু'টো গালি।' বাহাবা পার্ব্বতীয়া!

Bravo! কি বল মা! পার্ব্বতীয়াকে দেখনি—আহাহা! এমনটি হয় না মা! হয় না!"

কমল রাগিয়া কহিলেন—"দূর হতভাগা! পাজি নচ্ছার, মাতাল! যদি নিজের কিচ্ছু বুঝ্‌তিস্ তা হলে কি আর তোর এমন দুর্দ্দশা হয়!" "মা, মাতাল! মাতাল! বলো না—তা হ'লে আমি মরে যাব মা! মদের গুণ ত জান না mother! তা হলে বুঝ্‌তে এ কি অমৃত, একেবারে স্বর্গের দুয়ার খুলে দেয়!"

"কি যে বলিস্ ধীরু, তার ঠিক্ নেই! একটু হুঁস কর্! তোর ভাবনা ভেবেই ত আমার প্রাণ অস্থির! মাথায় জল দে! রাঁধা ভাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—খেয়ে জুড়ো। কাল সকালে কতকগুলো কথা কইব, এখন একটু সুধ্‌রে চল্।"

মাতালের নেশা মাথায় চাপিলে তা সহজে দূর হয় না—এবং যখন যেদিকে ঝোঁক পড়ে সে কথাই বলিতে থাকে, মাতার কথায়—ধীরেনের জেদ চাপিল, সে জড়িত কণ্ঠে কহিল—"কাল আর কি বল্‌বে মা, আজই বল না—পায়ে পড়ি মা, বল বল! তুমি আমাকে একেবারে Dam, fool মাতাল ঠাওরিও না, আমি ঠিক্ আছি মা—তোমার ছেলে কি কখনও বোকা হ'তে পারে?"

কমল কহিল—"তুই যদি বুঝ্‌তিস্ ধীরু তা হ'লে কি আর কোন ভাবনা ছিল ?"

"আমি কি না বুঝি মা, কেমন করে পয়সা আদায় করতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে—কেমন করে পার্শেলের জিনিষ চুরি করতে হয় সে জানি, আর তুমি বলছ মা আমি কিছু বুঝি না ! এমন গালমন্দ তুমি মা হয়ে ছেলেকে দিচ্ছ ?"

"সবই ত বুঝিস্—কিন্তু নিজের ভালমন্দ বুঝিস্ কই ? দেখ্‌তে ত পাচ্ছিস্—তোর বাড়ী—তোর ঘর—সবই ত পরের হাতে চল্‌লো বাবা !"

"কি যে বল মা—বুঝ্‌তে পারি না—সোজা বাংলায় সরল গদ্যে বল,—হেঁয়ালী ছেড়ে দাও।" ধীরেন চরিত্রহীন হইলেও—একেবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত ছিল না, যা কিছু হিংসা বা দ্বেষ তাহার প্রাণে বিকাশ পাইয়াছিল তাহাও মাতার ইন্ধন যোগাইবার দরুণ ও নিয়ত কুমন্ত্রণায়। সে নিরুপমাকে প্রকৃতই স্নেহ করিত—মাতুলকেও বরাবর শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিত, কিন্তু ইদানীং সে সব ভাব চলিয়া গিয়াছিল—অনবরত কমলের মন্ত্রণা-গুণে সে নিরুপমা ও শৈলেনকে ভয়ানক শত্রু জ্ঞান করিত—সময় সময় পিতৃতুল্য মাতুলকেও দু'চারিটা কর্কশ কথা শুনাইয়া দিতে ভ্রূক্ষেপ করিত না। স্নেহের অন্ধতায় স্বার্থের হীনতায় নারীচরিত্র কিরূপ বিকৃত হইতে পারে

কমলকামিনীর চরিত্র হইতে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ধীরেন কহিল—"কথাটা খুলিয়া বল না মা?" হঠাৎ কোন গভীর উত্তেজনায় মাতালের নেশাও ছুটিয়া যাইতে দেখা যায়। মায়ের কথায় ধীরেনেরও নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল। সে পুনরায় জোর করিয়া বিকৃত স্বরে কহিল, "বল না কি হয়েছে? এক্ষুণি তার বিধিব্যবস্থা কচ্ছি—নইলে আমি ধীরেন মুখুয্যে নই।"

"ওরে পোড়ারমুখো, তোর এ জেদ আর কতক্ষণ? নেশা ছুট্‌লেই আবার সব ভেসে যাবে।"

"কভি নেহি কভি নেহি আমি কি কুপুত্র মা? তুমি আমায় কুপুত্র বল? উঃ উঃ আমি আর এ ছার প্রাণ রাখ্‌বো না।" মাতালদের নেশার ঝোঁকের উপর একটা খেয়াল চাপিয়া গেলে সহজে আর তাহার নিষ্কৃতি থাকে না—নেশার ঝোঁকে জড়িত স্বরে এক কথারই পুনঃপুনঃ উক্তি করিতে থাকে। কমলকামিনী—নেশাখোর পুত্রের নেশাটা অন্যদিকে চালিত না হয় সেজন্য তাহার হৃদয়ের তীব্র বিষের একটা উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুত্রের ক্রমশঃই সে সব গভীর ষড়যন্ত্রের কথা শুনিবার ব্যাকুল আগ্রহটাকে সে কিন্তু তেমন আমল দিতে পারিতেছিল না। এখন কাজের কথা বলিলে কি আর মনে থাকিবে? নেশা কমিয়া গেলেই যে সে

সব ভাসিয়া যাইবে। তাই তিনি বলিলেন—"ধীরুবাপ! দু'টো ভাত খেয়ে আজ ঘুমিয়ে থাক। কাল ছুটির দিন আছে সব কথা বলবো। অনেক রাত্তির হয়েছে—এখন ঠাণ্ডা হয়ে ঘুম যাও।" মিনতির সুরে এ কথা কহিলেও ধীরেন সে ভাবে উহা বুঝিল না, এইবার সত্য সত্যই তীব্র হুঙ্কার দিয়া কহিল—"বুঝেছি তোমার সব মিছে কথা, মামার সর্ব্বনাশ করতে দিনরাত আমায় পরামর্শ দিচ্ছ—রসো, কালই ভোরে জেগে উঠে নিরুকে সব বলে দোবো, কোন কথা বল্‌বেন না কেবল ভূমিকা চল্‌ছে।" এইবার কমলকামিনী বুঝিলেন যে দুর্দ্দান্ত পুত্রকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব, তাই একটু বিনাইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—"ধীরু ভেবেছিলুম কাল বলবো, যখন কিছুতেই ছাড়লিনি তখন বল্‌ছি। এই যে একজন উড়ে এসে জুড়ে বসলেন—শিকড় বাড়্‌ছে লক্ষ্য কচ্ছিস্ কি?"

"কার কথা কইছ মা?"

"কার কথা? এ জন্যেই ত তোকে সরল হাবা বলি—শৈলেনরে শৈলেন,—কোথায় ছিল পাড়াগেঁয়ে আর এখানে দুবছরের ভিতর বড় চাকুরে হল, ছেলে হয়েছে, দেশ বাড়ীতে যাবার নামটি নেই। আর তুই কিসে অযুগ্যি বল্ ত? তোকে ভাল চাকরী না দিয়ে দাদা দিলে কিনা—জামাইটাকে এনে বড় চাকরী? তা ত যেন হলো, তারপর এ বিষয় সম্পত্তি তোরই

কি আর কিচ্ছু ভাগ্যে জুটবে। সব অই মেয়ে জামাইয়ের হবে—আর ঐ ক্ষুদে ছেলেটার। দাদা এখন আর এক মানুষ হয়েছেন—দিনরাত নাতি কোলে করেই আছেন, ভুলেও কি আর আমাদের খোঁজ নেন? আর নিরু—সে ত এখন রাজরাণী, পিসিমা বলে যে ডাকে সেই ঢের! তাই বল্‌ছি এখনও শোধরাও—এখনও মানুষ হও, আপনারটা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নে, আমি আর ক'দিন বাঁচবো ধীরু? এখনও বলি আমার পরামর্শ মত চল—সব ভাল হবে।" কমলকামিনী এমনি ভাবে এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন যে ধীরেন বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না, শৈলেনের উপর তাহার একটা জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল—সে কেন বি-এ পাশ করিয়াছে—সে কেন বড় চাকরী পাইয়াছে ও সাহেবদের আদর যত্ন পাইতেছে। কেন? কেন এ সব! মূর্খ ব্যক্তিরা তাহাদের অপেক্ষা পৃথিবীতে কেহ জ্ঞানী ও গুণী থাকিতে পারে তাহা সহ্য করিতে পারে না। শৈলেন যে কাজ করিতে পারে সে তাহা কেন পারিবে না? তাহার যোগ্যতা থাকিতেও তাহার মাতুলের এই পক্ষপাতিত্ব দোষ কখনও ক্ষমার যোগ্য নহে। ইহার প্রতিশোধ চাইই ত। মাতুলের সম্পত্তি তাহারই প্রাপ্য—তার উপরে এই অশান্তি! দমন করিতেই হইবে। ধীরেন মাতার কথা শুনিয়া কহিল—"মা তুমি ছাড়া আর এ পৃথিবীতে আমার আপনার বল্‌তে কে

আছে ? ঠিক্ কথা মা ! আমি তোমার কথা শুনে চল্‌বো—যা বল্‌বে মা তাই শুন্‌বো। কালিদাস ঠিক্ বলেছে মা—'কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনও নয়'।"

কমল হাসিয়া কহিল—"লক্ষ্মী বাবা আমার অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাক। তুই যদি মানুষ হস্ তা হ'লে আর কি ভয় ? সব ঠিক্ হয়ে যাবে বাবা ! সব ঠিক্ হয়ে যাবে।"

ধীরেন কহিল—"অবশ্য।" তারপর কোনরূপ টলিতে টলিতে উঠিয়া দুটী ভাত মুখে গুঁজিয়া—ধীরেন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাতাও মন্ত্রদান সার্থক হইয়াছে জ্ঞানে প্রফুল্ল-চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

১৩

নৃত্য ও সুষমার দিনগুলি কোনরূপে কাটিয়া যাইতেছে। অর্থের অভাব তাহাদের নাই। পল্লীগ্রামে মানুষ যেরূপ অর্থ পাইলে সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারে সেরূপ অর্থের অভাব তাহাদের ছিল না—শৈলেন প্রতি মাসেই উপযুক্ত পরিমাণ টাকা পাঠাইয়া দিত, কাজেই অভাবের পীড়ন তাহাদের ছিল না—শুধু ছিল না মনের মিলন। নৃত্য ভোর হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পাড়া বেড়াইয়া কাটাইত, কাহারও সঙ্গে কোঁদল করিয়া—কাহারও সালিশি করিয়া—কাহারও বধূ বা কন্যার বেহায়া-

পনার নিন্দা করিয়াই তাহার দিন যাইত,—আর সুষমা ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া সংসারের সব দিক্ গুছাইয়া সব করিয়াও নৃত্যের মন পাইত না। যাহাদের কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে না তাহাদের সমালোচনা করিবার দক্ষতা খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সুষমার রান্নার ত্রুটি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরকন্নার খুঁটিনাটির সমালোচনাটা বাহিরের দশজনের কাছে না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। হিন্দু পরিবারের পূর্ব্ব শান্তি ও সুখ অপসৃত হইবার প্রধান কারণ প্রাচীন পদ্ধতির অবহেলা বা নবীন শিক্ষা ও সভ্যতাকে বর্জ্জিত করা। প্রাচীন কালের গৃহিণীরা নিজ নিজ বধূ বা কন্যার দোষ বা ত্রুটি ঘরে গোপনে উপদেশ দিয়া সংশোধনের চেষ্টাই বেশী করিতেন—ফলে বধূরাও শাশুড়ী বা গৃহিণীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ত্রুটি সংশোধনে মনোনিবেশ করিতেন—বাহিরে বধূদের প্রশংসা প্রচারিত হইত। যে সকল পরিবারে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, যেখানে গৃহিণীরা বা কর্তৃপক্ষীয়া নারীরা বধূদের গ্লানি করিয়া নিন্দা করিয়া ফিরেন, সেখানে বধূরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সংসারেও অশান্তির আগুন জ্বলে,—ফলে যখন গৃহিণী কোনও আগন্তুক অতিথি মহিলার নিকট পুত্রবধূর নিন্দা প্রচারে উৎসুক হইয়া শত কণ্ঠে তাহা প্রচার করেন—তখন বধূরাও লজ্জার বাধা দূর করিয়া নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার

জন্য মুক্তকণ্ঠে কথা বলিতে সুরু করে—শ্বাশুড়ীও তখন বধূর বেহায়াপনা সহিতে না পারিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া নানারূপ তীব্র ভাষায় বধূর বেহায়াপনার নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন, বধূও আত্মপক্ষ সমর্থন করে, এরূপ কলহ পল্লীগ্রামের বহু পরিবারেরই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা;

নৃত্যের এইরূপ নিন্দাপরায়ণা স্বভাবের জন্য সে কাহারও নিকট অনাদৃত এবং কাহারো নিকট আদৃত হইত। আজ কালকার দিনের শিক্ষিতা রমণীরা—যাহাদের স্বামী বিদেশে থাকেন, নানা কারণে বিদেশে স্ত্রীকে লইয়া যাইতে পারিতেছেন না, তাহারা নৃত্যের কলহপরায়ণ প্রবৃত্তির জন্য বিশেষ অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, তাহারা তাহাকে বড় একটা আমল দিত না, কিন্তু যে সকল গৃহিণীরা নৃত্যের মত কুৎসাপ্রিয় তাহারা তাহাকে পরমানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া দশ বাড়ীর কুৎসা শুনিয়া লইত এবং শুনাইয়া দিত, এমন কি নিজের গোপনীয় ঘরের কথা বধূদের বেহায়াপনার কথাটুকু বলিতেও ইতস্ততঃ করিত না। নিজেকে ভালরূপে দশজনের কাছে পরিচিত করিবার আকুল আগ্রহ এমনি ভাবে মানবের মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে।

গ্রাম্য-জীবনের সংস্কারের একটা ধূয়া উঠিয়াছে—ধূয়া বলি এই অর্থে খবরের কাগজে ও বক্তৃতায় এ সকলের যতটা কড়া-

কড়ি দেখি কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার তদ্রূপ কার্য্যকারিতা কিচ্ছুই দেখিতে পাই না। নিম্ন শিক্ষা প্রণালী প্রচার দ্বারা দেশ ও সমাজের সর্ব্বত্র শিক্ষার শুভ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিবে—সে সময়সাপেক্ষ, একদিন দুইদিনের কাজ নহে। আমাদের প্রাচীনকালের কথকতার মত যদি সরল সহজ ভাষায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা হয়, স্বাস্থ্যের কথা বলা হয় তাহা হইলে অনেক সুফল অতি সহজে ফলিতে পারে। আমরা বিদেশী শিক্ষা ও জ্ঞান-লাভ করিতেছি—বিদেশী আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপেও মানিয়া লইতেছি, কিন্তু সে সকল দেশে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যে আদর্শ প্রচলিত সে আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ কোথায়? দেশের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত শিক্ষা—দেশের মূল আদর্শ হওয়া উচিত ত্যাগ— দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত পুরুষ ও মহিলার সমান দায়িত্ব, এবং উভয়ের সে দায়িত্বকে জাগ্রত উদ্বুদ্ধ এবং কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাদের সকলের সমভাবে চেষ্টা ও আগ্রহ থাকা কর্ত্তব্য। অনেক বাজে বকিলাম। সংসার চলিতেছিল, কিন্তু শান্তি ছিল না—সুষমা প্রাণপণ করিয়াও নৃত্যের মন পাইত না, আর নৃত্য কিছুতেই সুষমার কোন কাজ প্রশংসার চক্ষে দেখিত না। এইরূপ দুইটী বিরুদ্ধ স্বভাবের লোক একই বাড়ীতে একই ঘরে দীর্ঘ দুই

বৎসর যে কেমন করিয়া কাটাইয়াছিল তাহা বস্তুতঃই আশ্চর্য্যের বিষয়। আঘাত করিলেও যেখানে প্রতিঘাত হয় না,—নিন্দা করিলেও যেখানে নীরবতা, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা নাই, সেখানে আর কি করিয়া বিরোধ বাঁধিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু ক্রমশঃ সুষমার পক্ষেও চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইল, যেদিন সে দেখিতে পাইল যে এই নির্জ্জন পুরীতে তাহার চরিত্র, মান ও সম্ভ্রম বাঁচাইয়া থাকিতে সে পারিবে না তাহার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলিতেছে সেদিন তাহার নারীর গর্ব্ব, তেজ ও মহিমা দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল—শান্ত স্থির মূর্ত্তি দূর হইল—রুদ্র তেজ তাহার ললাটফলকে দীপ্তিমান হইল—সে হিমাদ্রির দৃঢ় অটল অচল শৃঙ্গের ন্যায় মহিমা গৌরবে দণ্ডায়মানা হইল—প্রলয়ের ভীম ভয়ঙ্কর ঝড় ও ঝঞ্ঝার শত আঘাত শত বিদ্রূপ সে সহ্য করিবেই—সে কথাটাই এক্ষণে খুলিয়া বলিতেছি।

কুমারীর তীরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের এক পাশে গ্রামের সন্নিকটে একটা খালের পারে খুব বড় একটা বট অশ্বত্থ গাছ। বট অশ্বত্থ গাছটির গোড়া ইটের বাঁধান, কে একজন বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী গৃহস্থ অক্ষয় বৈকুণ্ঠলাভের বাসনায় বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের বিবাহ দিয়া গোড়াটি বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। লোকে এ স্থানটিকে বিশেষ পীঠস্থান বলিয়া বিবেচনা করিত। প্রতি বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে সেখানে একটী মেলা বসিত। সে

মেলায় নানা গ্রামের নানা যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইত—সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সমাগমই বেশী হইত। সে সময়ে স্ত্রী-লোকেরা নানা কামনা করিয়া বট অশ্বত্থের দেহ সিন্দুরে রঞ্জিত করিয়া দিত। সেবার মেলা শেষে ঐ গাছতলায় এক সাধুর আবির্ভাব হইল। ইনি তান্ত্রিক সিদ্ধযোগী। মাথায় জটাজাল—পরিধানে লোহিতবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকমালা। ললাটে সিন্দুর লিপ্ত দীর্ঘ দেহ কৃষ্ণকায় ক্ষীণ দেহ এই সিদ্ধ পুরুষ নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সুরপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছেন। দুই মাস পূর্ব্বে সাধুর আস্তানা ছিল বট অশ্বথ তলা, কিন্তু শিষ্য সেবকের অনুগ্রহে এখন একটা ক্ষুদ্র ঘর উঠিয়াছে। দিবারাত্রি ভক্তবৃন্দের কোলাহলে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠে। গাঁজার ধূমে ও মদের গন্ধে ঐ স্থানটী সকল সময় দিব্য সৌরভময় হইয়া থাকে। বাবাজির নাম শ্যামানন্দ আগমবাগীশ—ইনি তন্ত্র মতে হোম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত করিয়া থাকেন। এলোকেশীর মেয়ের আঠার বৎসর পার হইয়া যায়—সন্তান হয় না, জামাতা পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, আগমবাগীশ মহাশয়ের ঔষধের গুণে—এক বৎসরের মধ্যেই সে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল। বৃদ্ধ রামচরণের ষাট বৎসর বয়সে পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় সংসার

অচল, সে স্বামীজির চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বিবাহের জন্য অনুমতি চাহিলেন, সদাশয় স্বামীজির আশীর্ব্বাদে—ছয় মাস মধ্যেই একটী ষোড়শী যুবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল! পিতা আগমবাগীশ অসাধারণ পণ্ডিত। যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেও তার জ্ঞানের সীমাই নাই, সে সকলের উপরে ও তাহার সাংসারিক নানা বিষয়ে অসামান্য অভিজ্ঞতা আছে। মাম্‌লা মোকদ্দমা, দলাদলি সর্ব্ববিষয়েই তিনি এখন এই গ্রামের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে সকল বৃদ্ধ মাতব্বর ব্যক্তিগণ আগমবাগীশকে পূর্ব্বে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহারাও আজ কাল তাহার ভক্ত-শিষ্য, অনেক সময় মাম্‌লা মোকদ্দমা সম্পর্কে তাহার নিকট পরামর্শ লইয়া মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। কলেজের ছেলেরাও ছুটিতে বাড়ী আসিয়া সাধুর ভণ্ডামিটা তর্কের খরকিরণে চারিদিকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া আগমবাগীশের অপূর্ব্ব ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া নতমস্তকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া আসিয়াছেন—তাহাদের পরাজয়ের পর হইতে সাধুর খ্যাতি আরও বাড়িয়া গিয়াছে, বিশেষ—মেয়ে মহলে। স্বামীর বশীকরণে—বন্ধ্যাদোষ নিবারণ ইত্যাদি নানারূপ কার্য্যে ইনি নারীদের প্রধান সহায়। তাহাদের ভক্তির দরুণ আগমবাগীশ মহাশয়ের আর কোনও কষ্ট নাই, তিনি

পূর্ব্বে যে ক্ষীণদেহ লইয়া আসিয়াছিলেন এখন তাহা দিব্য স্থূলত্বে পরিণত হইয়াছে। যে বাড়ীর যে ফলটি ভাল, যে বাড়ীর যে খাগুটি ভাল তাহাই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ গ্রামে আগমবাগীশের কয়েকজন চেলাও জুটিয়াছে ভাল—ইহারা সকলেই অকর্ম্মার দল। কাহারও বাবা—বিদেশে চাকরী করেন, কাহারও দাদা কষ্ট করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন—নিজেদের দুই বেলা দুইটা খাইবার ভাবনা নাই। এ কয়জন চেলার মধ্যে তারাচরণ, শিবরাম ও কালীপদ প্রধান। তারাচরণ—জাতিতে শূদ্র, বয়স চব্বিশ পঁচিশ,—এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, একহারা চেহারা, দীর্ঘাকার, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মাঝ দিয়া সিঁথি পাড়া, চোখ দুটী লাল ও গোল, দেখিলে মনে হয় যেন গাঁজার নেশায় ঢুলু ঢুলু। সাধারণতঃ লোকের মুখের দিকে চাহিয়াও সে কথা কহিতে নারাজ, বাহিরে অল্পভাষী, নিষ্কর্ম্মা; দাদা চাকরী করেন, আর ইনি বাড়ীতে থাকিয়া গ্রামের মাতব্বরী করেন। প্রথম নম্বর—মহিলাদিগের প্রতি কুৎসিত দৃষ্টিপাত ও অঙ্গভঙ্গী; অবিবাহিতা বয়স্কা বালিকাদিগের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করিয়া দিতে সদাই তৎপর। রাত্রিতে লোকের বাড়ী সিঁদ কাটিতেও ইহার দক্ষতা অসাধারণ। আবার বিপদের সময়েও গ্রামের লোকে ইহার সাহায্য লাভে

বঞ্চিত হয় না, বিশেষ মড়া পোড়াইতে—রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে সর্ব্বদাই গ্রামের লোকেরা ইহার সাহায্য পান। এই পরোপকারের জন্য ইহার শত দোষ ত্রুটিও লোকে উপেক্ষার চোখে দেখিত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহার দোষের মাত্রাটা গুণের পরিমাণে অতি বেশী ছিল; উহা কতকটা ভণ্ডামির রূপান্তর মাত্র। দ্বিতীয় শিবরাম—বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গ্রামের লোকে 'দুর্ব্বাসা' আখ্যা দিয়াছিল। এরূপ কোপন-স্বভাবের লোক দশ গাঁয়েও বড় একজন মিলে কিনা সন্দেহ। ইহাঁর মাথার চুল জটাজুটে; খালি বাড়ীতে বসিয়াও ব্রহ্মশাপ প্রয়োগে কোন না কোন পরিবারের সবংশে নিধন কামনা করিতেন। ইনি সরিকের সহিত কলহ করিয়া পুকুরের মাঝখানে বেড়া দিয়া পুকুর ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। শিবরাম ইহার পুত্র—বাল্যকাল হইতেই কুসংসর্গে মিশিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া নানারূপ নেশার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল—কুৎসিত ভাষায় লোককে গালাগালি দিতে; লোকের বাড়ীর ফল-ফলারি চুরি করিতে ইহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। একজন প্রৌঢ়া ধোপানীর সহিত ইহার একটা কুৎসিত অভিযোগ গ্রাম মধ্যে রাষ্ট্র ছিল। এই ব্রাহ্মণনন্দন গোপনে সেই ধোপানীর গৃহে অন্নও গ্রহণ করিতেন বলিয়া দুষ্ট লোকে প্রচার করিত।

শিবরামের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামবাসী কেহ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অভিযোগ করিলে, তিনি দুই চক্ষু রক্তজবার মত লাল করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিতেন—"শালারা ব্রহ্ম-শাপেরও ভয় করে না।" দুই একজনকে খাঁড়া হস্তে বধ করিবার জন্যও দুই একবার দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন। ইনি বৎসরের মধ্যে ছয় মাস নানা জেলায় ও গ্রামে ঘুরিয়া স্বস্ত্যয়ন ও হোম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন। বিদেশে ইহার ব্রহ্মণ্য-তেজ কোন অনাচারেই খর্ব্ব হইত না, কিন্তু দেশে লোকের সংসারের ও আচারের সমালোচনা করিয়া দলাদলি বাঁধাইয়া দিন কাটাইতেন। ইনি যে কয় মাস গ্রামে থাকিতেন—সে কয় মাস গ্রামের লোক প্রমাদ গণিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের লোকের উন্নতিতে হিংসায় জ্বলিতেন,—গ্রামের কাহারো ছেলের পড়াশুনার খ্যাতি শুনিলে অন্তরে দগ্ধ হইতেন ও সে সব ছেলের চরিত্রহীনতা ও স্বেচ্ছাচারের কথা লোকের নিকট কহিয়া বেড়াইতেন। নিজের ছেলে শিবরাম পিতার অন্ধ স্নেহে দিন দিনই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছিল। স্নেহান্ধ পিতামাতার শাসন-দোষে এমন করিয়াই বালকবালিকারা চরিত্র-হীন হইয়া পড়ে। স্নেহ এক,—শাসন আর। স্নেহ করিতে হইবে বলিয়াই যে ছেলেকে শাসন করা দূষণীয়—এরূপ জ্ঞান যাহাদের, তাহারাই নিজ নিজ পুত্রকন্যার ভবিষ্যতে অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন।

কালীপদ—গ্রামের হরিচরণ শীলের ছেলে। হরিচরণ জাতিতে নাপিত, ব্যবসায়ে কবিরাজ। সে কোন্ দিন কোন্ কালে একজন বৈদ্য চিকিৎসকের নিকট থাকিয়া ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছিল—সে ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া অতি বড় প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ। তাহার গুরু বৈদ্য ছিলেন বলিয়া বৈদ্য জাতির উপর তাহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল—গ্রাম্য কোনও বৈদ্য ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইলেই তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিতেন—"আশীর্ব্বাদ কর্বেন, যেন হাতযশ বাড়ে,—আপনারা আমার গুরুবংশ।" হরিচরণ প্রকৃতই নিরীহ প্রকৃতির লোক, কোনরূপ গোলমালের ভিতর সে যাইত না,—সারাদিন ঘুরিয়া টাকাটা সিকেটা উপার্জ্জন সে প্রত্যহই করিত, তালিকা দেখিয়া চিকিৎসা করিলেও তাহার ঔষধ নির্ম্মাণে দক্ষতা ও চিকিৎসার একটু হাতযশঃ ছিল। লোকে তাহার বিনয়-নম্র ব্যবহারে দুই দণ্ড কাছে বসাইয়া আলাপ করিত। সে মিষ্টভাষী ছিল বলিয়া—কেহই তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইত না। হরিচরণের ইচ্ছা ছিল তাহার একমাত্র পুত্র কালীপদ—ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া, ডাক্তারী পড়িয়া তাহার ব্যবসাটা বজায় রাখে। সে আশায়ই সে পুত্রকে স্কুলে পাঠাইয়াছিল—কিন্তু কালীপদের বিদ্যা অপেক্ষা অবিদ্যার প্রতিই অধিকতর প্রীতি দেখা যাইত। সে প্রতি-

ক্লাসে দুই তিন বৎসর থাকিয়াও যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে পারিল না, তখন হরিচরণ তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া চ্যবনপ্রাস, ও পাকের বড়ি প্রস্তুতের কৌশলটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হায়! মানুষ ত অমর নহে, যাহা করিবার তাহা সময় থাকিতে করাই ভাল নহে কি? কিন্তু হায়! সকল পিতার বাসনাই যদি পূর্ণ হইত তাহা হইলে আর পৃথিবীতে দুঃখ রাখিবার কি ছিল? কালীপদ মানুষ হইল না—কুসংসর্গে মিশিল। হরিচরণের কথা সে বড় একটা গ্রাহ্য করিত না, তাহার আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচান উড়ানী ও পম্পসু শোভিত পদযুগল ও মস্তকের দশ আনা ছ আনা করিয়া ছাঁটা চুল দেখিলে তাহাকে কেহই হরিচরণ শীলের পুত্র কালীপদ শীল বলিয়া মনে করিতে পারিত না।

শিবরাম, তারাচরণ ও কালীপদ এই তিনজনে বড় বন্ধুত্ব। এক আত্মা এক প্রাণ। শ্যামানন্দ আগমবাগীশের ইহারা তিনজন মন্ত্রশিষ্য। গভীর রাত্রিতে স্বামিজীর আশ্রমে এই তিনজন মিলিত হইয়া নানারূপ গভীর পরামর্শে নিযুক্ত থাকিত। শ্যামানন্দ আগমবাগীশ একদিন শিষ্যদিগকে কহিলেন—"বাবা সকল, আর এখানে থাক্‌ছি নি, সাধনের মহা ব্যাঘাত ঘট্‌ছে! আর চক্রে বস্‌বারই ব্যবস্থা কত্তে

পাচ্ছি না! শিষ্যেরা কহিল—"কেন বাবা? আমাদের কি কোন সেবার ত্রুটি হচ্চে?"

স্বামিজী কহিলেন—"না—তবে কি জান! সাধনের আয়োজন হচ্চে না!"

তিন শিষ্য সমস্বরে কহিল—"কখনও ত আদেশ করেন নি গুরুদেব!"

"তা বটে! তা বটে! সম্মুখেই অমাবস্যা, এই অমাবস্যাতে একটা যজ্ঞ করবো। কিন্তু বড় ভয়ানক কথা—ব্রাহ্মণের বিধবা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন, তিনিই আমাদের সাহায্যকারিণী হইবেন। সে কি করে হয়? যদি এই যজ্ঞ শেষ করতে পারি তা হ'লে বুঝ্‌লে—আমাদের একেবারে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ।"

"সেজন্য আপনি ভাব্‌ছেন কেন? সে ব্যবস্থা আমি কর্‌বো। শুধু আদেশ পেলেই যে হয়।"

"বেশ—বেশ, তা'হলে আয়োজন কর।"

"কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হবে? বলুন এখন থেকেই যোগাড় দেখি, সময়ও ত আর বেশী নেই—এই ত আর পাঁচ দিন।"

"অন্যান্য সবই আমার যোগাড় আছে,—তোমরা শুধু একটী পাঁটা, উপযুক্ত রূপ কারণ-সলিলের সংস্থান রেখো! আর ঐ একজন ব্রাহ্মণকন্যার প্রয়োজন! এই ত মুস্কিল বাবা!"

"সে ভাব্‌বেন না, সে সব হ'বে।"

শিষ্যদের স্তোকবাক্যে ও আশ্বাস বাণীতে গুরুজী আশ্বস্ত হইলেন; তারপর কারণ-সলিল যথারীতি শোধন করিয়া লইয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের সলিল পানে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া এমনি অবস্থা হইল যে এক গুরুজী ব্যতীত আর সকলেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। ইহারা শ্যামানন্দ স্বামিজীর কৃপালাভ করিয়া সবে মাত্র কারণ-সুধাপানে অভ্যস্ত হইতেছে, সেহেতু এখন পর্য্যন্ত তাহারা ভালরূপ তাল সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। স্বামিজী মহাপুরুষ—কাজেই দুই এক পিপে হজম করিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারেন। স্বামিজীর পূর্ব্ব ইতিহাস কেহই জানিত না;—আর সাধু-পুরুষদের সে সব কথা জানিবার জন্যও কেহই তেমন ব্যস্ত হয় না। আমাদের দেশের এমনি বিচিত্র ব্যাপার যে সন্ন্যাসের ভানে কেহ আপনাকে পরিচিত করিলেই দেশের লোকেরা তাহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে। কুলনারীদেরও এই শ্রেণীর লোকের নিকট অনায়াসে যাতায়াত করে; অভিভাবকেরাও তাহাতে কোনরূপ বাধা দেন না। স্বামিজী এ গ্রামের নারীদের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহিলারা নিঃসঙ্কোচে এ স্থানে যাতায়াত করিত। কোনও স্ত্রীলোক স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইলে বিশেষ কোন গোপনীয়

কথা থাকিলে তিনি গৃহের একপার্শ্বে লইয়া যাইয়া নিভৃতে আলাপন করিতেন। নৃত্য স্বামিজীর একজন ভক্ত শিষ্যা হইয়াছিল। এমন কি স্বামিজী তাহাকে কারণরূপী সঞ্জীবনী সুধাও সময় সময় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ফলে দীক্ষাটা বেশ ভালরূপেই জমিয়া উঠিয়াছিল। স্বামিজীর আদেশে এই শিষ্য তিনজন নৃত্যকে মা বলিয়া ডাকিত। নৃত্য ইহাদিগকে সন্তান নামে সম্বোধন করিত। এই তিনটি শিষ্যই আবার মাতৃহীন ছিল। কাজেই মাতৃহীন সন্তানগণ মা পাইয়া একটু অতিরিক্ত-রূপে মাতৃভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামিজী তাহার সম্প্রদায়ের নাম রাখিলেন "মাতৃ-সম্প্রদায়"। গ্রামের অকর্ম্মণ্য যুবকদল অনেকেই মাতৃ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে আরম্ভ করিল; ফলে নিজ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়াও এই শ্রেণীর যুবকেরা অতিমাত্রায় মাতৃভক্ত হইল। মানুষের দুর্ব্বলতা যে কোথায় কিরূপ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে তাহার স্থিরতা নাই। নৃত্যের চরিত্রের দুর্ব্বলতা এইরূপ ভাবে ধরা পড়িবে তাহা অনেকের নিকটই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

স্বামিজীর নৃত্যের প্রতি একটু বিশেষ নজর পড়িয়াছিল। নৃত্য যুবতী না হইলেও পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেও তাহাকে যুবতীর ন্যায়ই দেখাইত। সে একান্ত সুশ্রী না হইলেও—কুৎসিতা ছিল না। তারপর অল্পস্বল্প লেখাপড়াও জানিত, পাড়ার

লোকের ছিদ্রান্বেষণে সে অদ্বিতীয় ছিল। কাজেই স্বামিজীর নিকট যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামের সহিত যে একটা কুৎসিত দুর্নাম রটিতে লাগিল তাহাতে সে বিন্দুমাত্রও বিচলিতা হয় নাই—গ্রামের লোকেরও সেটা বেশ ভালই লাগিতেছিল। স্বামিজীর কুহকে নৃত্য হাবুডুবু খাইতেছিল। তারপর চেলার দলের মা হইয়া ইতরশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধালাভে তাহারও মনে হইতেছিল যে এইরূপ ধর্ম্মের ভাবটা মন্দ কি? ফলে আজকাল নৃত্যের ধর্ম্মভাবটা পঞ্চমে চড়িয়াছিল। গভীর রাত্রিতে সে সন্তানদের সহ নিজ বাড়ীতে ধ্যানে বসিত। সন্তান তিনটীর সহিত একই কক্ষে নিশি যাপন হইত। ভাই টাকা পাঠাইত, সংসারের সামান্য আয় হইত। তারপর সন্তান তিনটীর হস্ত-পরিচালন বিদ্যা গুণে মাতৃ-মন্দিরে নানাবিধ সুরসাল দ্রব্য উপস্থিত হইত। ভোরের বেলা এক কড়া চা প্রস্তুত হইত, সেই প্রসাদ নিবেদিত হইলে সকলে মিলিয়া গ্রহণ করিতেন। তারপর নৃত্য গভীর ধ্যানে বসিত, তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। সন্তানগণও মাতার ন্যায় যোগাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নয়ন-জল ফেলিত! কেহ কেহ বা ভক্তির প্রাবল্যে মূর্চ্ছা যাইত! সুষমাকে বহু চেষ্টা করিয়াও নৃত্য স্বামিজীর নিকট লইয়া যাইতে পারে নাই। তারপর এ সকল কুক্রিয়ায় কোনরূপেই সে যোগ দিতে আসিত

না, এজন্য ইহারা তাহাকে জব্দ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে-ছিল। স্বামিজীর—ব্রাহ্মণ-বিধবার সাহায্য অর্থে সুষমাকেই যে লক্ষ্য সে কথা শিষ্যেরা বুঝিয়াছিল। তাই পরদিন ভোরের বেলা স্থির হইল যে নৃত্যমায়ের নিকট বলিতে হইবে যে এই যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানটি তাহাদেরই বাড়ীতে হইবে। তিনি যেন সেরূপ আয়োজন করেন, আরো কতক অতি গভীর পরামর্শ স্বামিজী শিষ্যদের সঙ্গে অতি গোপনে সম্পন্ন করিলেন। আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। শুধু এইমাত্র জানা গেল যে শিষ্য তিনজন ও নৃত্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া নানারূপ দ্রব্যাদির সংগ্রহে প্রবৃত্ত—স্থান নৃত্যমায়ের বাড়ী; কারণ স্বামিজী পুনঃপুনঃ শিষ্যদের ও শিষ্যাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে কোনও নূতন স্থানে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে। সুষমা ইদানীং নৃত্যের এইরূপ ব্যবহারে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল—এবং পদে পদে বিপদ গণিতেছিল। কাজেই পূর্ব্বাহ্নে কোন কথা প্রকাশ পাইলে যদি সে একটা বিঘ্ন ঘটায় এজন্য তাহারা এবার অতি সংগোপনে সমুদয় আয়োজন করিতেছিল।

নৃত্যের এইরূপ পরিবর্ত্তনে গ্রামের অন্য কেহ দুঃখিত না হইলেও এই পরিবারের হিতৈষী বন্ধু বৃদ্ধ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন—তিনি নৃত্যকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে কাজটা ভাল হইতেছে না, কোথাকার এক

বেটা কে, তাহার সহিত এত মেলামেশা কেন? আর গ্রামের এ সকল গুণ্ডারাই বা তাহার বাড়ীতে দিবারাত্রি আড্ডা করিতেছে কেন? সে যদি এখনও সতর্ক না হয় তাহা হইলে তিনি শৈলেন্দ্রকে না জানাইয়া কোনরূপেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।

নৃত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিল যে, বুড়ো বয়সে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, এখন তাঁহার কিছুকাল মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৪

ধর্ম্মের নামে আমাদের দেশে যে কতরূপ ভণ্ডামি চলে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। শিক্ষিত লোকেরাও এ সব বিষয়ে উদাসীন, অথচ হয়ত তাহাদের পরিবারেরই কেহ না কেহ ঐরূপ ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেন। ধর্ম্মের প্রকৃত মূলতত্ত্ব—প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা কতকগুলি দেশাচার বা লোকাচারকেই মাথায় তুলিয়া নৃত্য করি। সমাজের বদ্ধ স্রোতে আজ বাহিরের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষীণা স্রোতা তরঙ্গিণীর বুকে সমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাস বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। এ উচ্ছ্বাসে পঙ্কিলতা, এ উচ্ছ্বাসে দুর্ব্বলতা দূরে যাইবে। তাহার গতি রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

সেদিন ভোর হইতেই পূজার আয়োজন আরম্ভ হইল। শিষ্যগণ নৃত্যের শয়নকক্ষ ধুইয়া মুছিয়া পূজার উপাদানে সজ্জিত করিয়া ফেলিল। গভীর নিশায় পূজা হইবে। সন্ধ্যা হইতেই সেদিন বড় দুর্যোগ—কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল। নির্জ্জন কক্ষে শিষ্যগণ ও গুরুজী সমবেত। বাহিরে ভীষণ ঝড়—কক্ষের ভিতরেও ধর্ম্মের প্রবল তুফান প্রবাহিত। নৃত্য এলায়িতকেশা—লোহিতবস্ত্রপরিহিতা। হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে একটী বৃহৎ সিন্দূর চিহ্ন।

তান্ত্রিক মন্ত্রে স্বামিজী পূজা করিতেছেন, আর শিষ্য-শিষ্যাগণকে কারণ-বারি পান করাইতেছেন। মদ্যপানে সকলেই বিভোর। নৃত্যের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ—নেশায় ঢুলুঢুলু—স্বামিজী বলিলেন, "এখন চক্রে বসা প্রয়োজন। কই তোমার ভ্রাতৃবধূ কোথায়, তাহাকে লইয়া এস। সময় বহিয়া যাইতেছে, আর বিলম্ব নাই, এখনি নিয়ে এস—জয় মা কালী!" শিষ্যগণও ভীষণ স্বরে জড়িত-কণ্ঠে কহিল, "জয় মা কালী।" নৃত্য টলিতে টলিতে পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে ভ্রাতৃবধূকে ডাকিয়া আনিতে চলিল—তাহার পা আর চলে না—সে বাহির হইতে কক্ষের দরজায় আঘাত দিয়া কহিল—"বৌ! একবার এখানে এস—ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নাও।" সুষমা পূজার আয়োজন দেখিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে

তাহার শয়নকক্ষের অর্গল উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দুশ্চিন্তায় শয্যায় পড়িয়াছিল।—এক্ষণে ভৃত্যের আহ্বানে সে শিহরিয়া উঠিল! আজ যে তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। কি সে করিবে? দয়াময় হরি! এ দীনাকে রক্ষা কর। সুষমা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমাকে কি প্রয়োজন? আমায় আর আশীর্ব্বাদ কিসের জন্য ভাই! কুমারীর তীরেই ত আশা আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমরা আশীর্ব্বাদ নাও। আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

"সে কি হয়? আজ বড় সুদিন। স্বামিজী বলিয়াছেন, আমরা আজ সাক্ষাৎ মা কালীর দর্শন পাব। এস ভাই—আস্‌তেই হ'বে।" সুষমা কহিল—"কথ্‌খনো না, এ সব ভণ্ডামি আমার ভাল লাগে না। ধর্ম্মের নামে আমি এ সব অত্যাচার সইতে পারি না—তুমি যাও ধর্ম্ম করগে—আমি যাব না।" "কি যাবে না? যেতে হবে—স্বামিজীর আদেশ, বলি মানে মানে বেরিয়ে এস—নইলে আজ আর তোমার রক্ষা নেই।" "বেশ ভগবান আছেন। তিনিই আমার মান-সম্ভ্রম রক্ষা কর্‌বেন। ঠাকুরঝি, তুমি এতদূর অধঃপাতে গেছ যে আপনার সহোদর ভাইয়ের স্ত্রীর সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত। কোথাকার কে এক বেটা ভণ্ডকে নিয়ে কি এ সব?" সুষমা একটু উত্তেজিত স্বরে এই কথা বলিয়াছিল।

সহসা শিষ্য তিনজন দ্রুতবেগে টলিতে টলিতে সেখানে আসিয়া গর্জ্জিয়া কহিল—"কি এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমাদের স্বামিজীকে ভণ্ড বল্‌ছিস্? দাঁড়াও এখুনি ঢিট্ করে দিচ্চি!" "খবরদার কুকুরের দল—জানিস্ কার সঙ্গে কথা কইছিস্?"

"চোপ্‌রাও শালি! ওরে কালীপদ দোর ভেঙ্গে ফেল্! ভেঙ্গে ফেল্—কি এত বড় অপমান!" স্বামিজী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভীমভৈরব কণ্ঠে কহিলেন, "মায়ের আদেশ—মা ভবানীর আজ্ঞা নির্ভয়ে তোমরা দোর ভেঙ্গে এই পাপীয়সীকে চক্রস্থলে নিয়ে এস! জয় মা কালী!" বাহিরে তখন প্রবল বাতাস ভীষণ রবে বহিয়া যাইতেছিল, আর মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। পাষণ্ডের দল উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিতে করিতে সুষমার শয়নকক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই অন্ধকার গৃহে কেহই সহসা প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। স্বামিজী আলোক হস্তে সেখানে আসিয়া আদেশ দিলেন, "বৎসগণ, আর কি দেখ্‌ছ, অই যে পাপীয়সী দাঁড়িয়ে, নিয়ে এস—এখনি নিয়ে এস!"

কালীপদ অগ্রসর হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্রই সুষমা কহিল, "সাবধান! এক পা অগ্রসর হবি ত তোর রক্ষা থাক্‌বে না—সাবধান!" কে বলিবে এ কুলনারী? যে মূর্ত্তিতে দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, যে মূর্ত্তিতে রণরঙ্গিনী

চণ্ডিকা রক্তবীজের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন এ যে সেই মূর্ত্তি—এলায়িতকেশা বিস্রস্তবসনা শোণিতাস্ত্রশোভিতা সতীত্বের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ভীষণা ভৈরবী মূর্ত্তি! কালীপদ ভয়ে পিছাইয়া গেল, এক নিমেষে তাহার মাতলামো দূরে গেল—সে "ওরে বাবারে" বলিয়া বিকট চীৎকারে বাহির হইয়া আসিল। তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। স্বামিজী ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! কি যে করিবেন ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই দলের মধ্যে সকলের চেয়ে সাহসী ও জীবনের মমতাশূন্য ছিল তারাচরণ, সে একপাশে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সুষমা যখন কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া দা-হস্তে এইরূপ ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছিল—সহসা সে ব্যাঘ্রবৎ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আর দেখ্‌ছিস্ কি, এইবার নিয়ে চল্"—তখন সুষমার শত চীৎকার আর বাধা রহিল না। একা একজন কুলরমণী কতক্ষণ পাষণ্ডদের সহিত লড়িতে পারে? স্বামিজী প্রবলভাবে চীৎকার করিয়া কহিল, "জয় মা ভবানী!" শিষ্যগণ ও নৃত্য জড়িতস্বরে কহিল, "জয় মা ভবানী!" স্বামিজী বজ্র-হস্তে সুষমাকে আকর্ষণ করিয়া চক্রস্থলে লইয়া আসিলেন, মূর্চ্ছিতাপ্রায় অবলা নারী উত্তেজনা শেষে অবশদেহে সেইখানে নীতা হইল। তারপর

গুরুজী কহিলেন, "আমি তোমাকে শিষ্যা করিবার জন্য অনেক দিন থেকেই ব্যগ্র ; জান না তুমি তন্ত্রের সাধনের ন্যায় মহা সাধন আর নেই। কালীপদ, দাও বাবা, এ'কে কারণবারি দাও।"

সুষমা কহিল, "বাবা! আমায় বাঁচাও, আমার মান ভিক্ষা দাও, আমি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা—আপনি আমার পিতা, দোহাই আপনার!"

একসঙ্গে শিষ্য তিনজন চীৎকার করিয়া কহিল, "আর নেকামো কর্‌তে হ'বে না! এই নাও—"

"উঃ—এই আমার অদৃষ্টে ছিল! হায়! ভগবান! এই তোমার বিচার, অসহায়া দীনা রমণীকে রক্ষা কর্‌তে কি কেউ নেই। উঃ আমার যে প্রাণ যায়! দয়াময় আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষা কর। কে কোথায় আছ—আমায় এ বিপদ থেকে বাঁচাও—এর চেয়ে যে মরণও অনেক শ্রেয়ঃ!"

কে তাহার কথা শুনিবে? কে তাহার মান রক্ষা করিবে? পাষণ্ডের দল বিজয় গৌরবে আত্মহারা হইয়া কুৎসিত অঙ্গ-ভঙ্গী ও ভাষা প্রয়োগে ক্ষান্ত রহিল না। সুষমার এইরূপ বেহায়াপনা নৃত্যের ভাল লাগিতেছিল না। পাপী পাপকেই ভালবাসে। চরিত্রহীনা রমণী চরিত্রবতী রমণীর মর্ম্ম কি বুঝিবে? সে চাহে বিশ্বের সমগ্র রমণীজাতি তাহার তুল্য

হউক। নৃত্য কহিল, "কেন বউ গোল কচ্চিস্, জানিস্ স্বামিজী সাক্ষাৎ শিব, শিব আর শক্তি নিয়েই ত সংসার! এ কারণ সাক্ষাৎ অমৃত, খেলেই আনন্দ! এক ঢোক্ খেয়ে নাও —প্রাণ আনন্দে নৃত্য কর্‌বে। আমাদের মত মজা পাবে! আনন্দ! আনন্দ!" "ঠাকুরঝি, তুমি এতদূর অধঃপাতে গেছ! উঃ! আর যে সয় না!"

তারাচরণ যমদূতের মত একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। এইবার এক পাত্র কারণ লইয়া কহিল, "কেমন করে জব্দ কর্‌তে হয় সে আমি জানি, এইবার এদিকে এস ত চন্দ্র-বদনি! নাও ঢুক্ করে গিলে ফেল! নইলে যদি আবার কোন ভণ্ডামি কর—আর রক্ষা থাক্‌বে না! বুঝলে!" "আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তবু আমি পাপে ডুববো না, মরণ ভয় আমি করি না, আমায় মেরে ফেল, ব্যস, এক নিমেষে সব ফুরিয়ে যাক্!"

বাহির হইতে হঠাৎ একসঙ্গে প্রবলবেগে কাহারা যেন দরজায় আঘাত করিল। পুরাণ কবাট সে আঘাত সহিতে পারিল না, ঝনাৎ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর সেই সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুষমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেন সব ফুরিয়ে যাবে মা! তুমি বেঁচে না থাক্‌লে ধর্ম্মের প্রভাব কে দেখাবে।

শৈলেন, দেখ—দেখ—দেখ্‌ছো ত আর একটু বিলম্ব হ'লেই কি সর্ব্বনাশ হ'ত। দারোগাবাবু কি দেখছেন, এক্ষুণি এদের হাত-কড়া পরান!"

দারোগা বঙ্কিম লাহিড়ী নব্যশিক্ষিত যুবক। বি-এ পাস। পেটের দায়ে পুলিশ-বিভাগে ঢুকিয়াছেন। বিদ্বান, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তিনি গোপনে গোপনে বহুদিন হইতেই শ্যামানন্দ স্বামিজীর ক্রিয়া কলাপ লক্ষ্য করিয়া অসিতেছিলেন, কিন্তু সহসা কিছু করিতে সাহসী হন নাই। কারণ স্বামিজী চারিদিকের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের মধ্যেও একটা প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। এতদিনে নানাভাবে নানারূপে কীর্ত্তি-কথা জ্ঞাত হইয়া এই ভণ্ড সাধুকে জব্দ করিবার সুযোগ পাওয়া মাত্রই সদলবলে চলিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য যে দারোগা বাবুর ইঙ্গিতে একে একে সকলের হাতেই হাতকড়া পড়িল। স্বামিজীর পৃষ্ঠে ভীষণ চাবুকের আঘাত পড়িল। নৃত্যর দিকে চাহিয়া বঙ্কিমবাবু কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণের কুলনারী বাল-বিধবা, শৈশব হইতেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করেছেন, আর আপনার এই কাজ! নিজ পরিবারের সর্ব্বনাশ নিজেই করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন? ছিঃ ছিঃ! আমি আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ছেড়ে দিয়ে গেলাম। সাবধান! এইবার সতর্ক হউন, ভবিষ্যতে কোন কিছু হ'লে কিন্তু আর আপনাকে বাঁচাতে পারবো না!

বাঁড়ুয্যে মশাই, প্রণাম। আপনি মানুষ নন দেবতা, শৈলেনবাবু! এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্যই আজ আপনার জাতি-কুল সব রক্ষা হইল।" দারোগাবাবু সদলে আসামীসহ চলিয়া গেলেন।

শৈলেন স্তম্ভিতপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে নৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দিদি! তোমার এই কাজ?" নৃত্য কোন কথা কহিল না, নীরবে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আজ শৈলেন্দ্র বুঝিল, সংসার শুধু ভীষণ নহে, ইহা মানুষ নামে পশুর বাসভূমি। পৃথিবী ধ্বংস হয় না কেন? না এখনও হরিদাস বাড়ুয্যের মত দেব-চরিত্রের লোক গ্রামে বাস করে বলিয়া।

১৫

গ্রামের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে তোমাদের ভাল লাগে না। কেননা তোমরা নগরবাসী। তোমাদের অনেকের ত পল্লী-গ্রামে যে কোন কালে বাড়ী ছিল, সে কথা স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ কর। সেখানে ভাল জল নাই, ইলেক্‌ট্রিক ফেন নাই, প্রশস্ত পথ নাই, আবার পথে আলো নাই, ভাল খাবার মিলে না; তেমন কাল্‌চারড্‌ ইয়ার বন্ধু জোটে না, সেখানকার লোকে সকালে সন্ধ্যায় চা খাইতে জানে না, তার উপর তারা অসভ্য বর্ব্বর—মনের ভাব গোপন করিয়া কথা বলিতে পারে

না। এক কথায় তাহারা শিক্ষিত সমাজের যোগ্য নয়। তাই যাহারা শিক্ষিত, যাহারা উন্নত, যাহারা বড় দরের সরকারি কাজকর্ম্ম করে তাহারা বিদেশেই বাড়ী ঘর করিয়াছে। দেশের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে। দেশের বাড়ী এখন পতিত জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নদশায় নিপতিত।

শৈলেন্দ্রনাথ তিন বৎসর পর বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাহার সেই সাধের জন্মভূমি আর আগের মত নাই—নির্জীব অসার প্রাণহীন। বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষিতের দল বিদেশে। শুধু যাহাদের শক্তি সামর্থ্য তেমন নাই, অর্থের তেমন আয় নাই তাহাদের স্ত্রী পুত্রেরাই গ্রামে বাস করিতেছে। ফলে দেশে ক্ষমতাশালী বিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবেই নানারূপ পাপ নানাভাবে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে। দুর্বৃত্তদের পাপ প্রবৃত্তি কে ঠেকাইয়া রাখিবে বল? অনেকে হরিসভা ইত্যাদি করিয়া গ্রাম্য দুর্নীতিপরায়ণ যুবকদের চরিত্র সংশোধনের জন্য আর একটা ধর্ম্মের ভাণ সৃষ্টি করেন। হরিনাম কীর্ত্তনের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মধ্যে 'হরি হরি' বলিয়া ইহারা 'দশায়' পড়ে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাম মাহাত্ম্যের অগৌরব করে। যেখানে শিক্ষা নাই, যেখানে চরিত্র গঠনের কোন উপায় নাই, সেখানে লক্ষ হরিনামেও কোন ফল হইবে না।

সারারাত্রি বৃষ্টির পর ভোরের আকাশ মেঘবিহীন নির্ম্মল শ্রী ধারণ করিয়াছে। গাছপালা সজীব ও সুন্দর ; মলিনত্ব মুছিয়া গিয়া নবীন শোভা ধারণ করিয়াছে। পল্লীর সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া বৃদ্ধ হরিদাস বাড়ুয্যে ও শৈলেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়াছেন। পথের দুইধারে বাঁশের ঝোপ, গাব ও হিজল গাছ, অন্ধকার করিয়া আছে, রাস্তার দুইধার দিয়া সঙ্কীর্ণ খাল, খাল ভরিয়া গিয়াছে, যেখানে সামান্য জল আছে, সে জলের রং গভীর কৃষ্ণবর্ণ, গাছের পাতা পচিয়া অতি বড় দুর্গন্ধময় বাষ্প নির্গত হইতেছে, আর সে জলের মধ্যে রাশীকৃত পোকা কিলবিল করিতেছে। তাঁহারা যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন সে পথে অতিকষ্টে সূর্য্যের আলো গাছপালার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল। বাড়ুয্যে মহাশয় কহিলেন, "শৈলেন! কি দেখ্ছো, গ্রাম আর গ্রাম নেই, কিন্তু আমি অতীতের গৌরব করবো না, বর্ত্তমানে কি করে গ্রামকে বাঁচাতে পারি তাহাই আমার লক্ষ্য। আজ তুমি সম্পত্তিশালী না হইলেও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছ, বেঁচে থাক্‌লে আরও করবে। তুমি জান আমি নিঃসন্তান বিপত্নীক, আমার যা কিছু ভূ-সম্পত্তি বা সঞ্চিত অর্থ আছে আমি সকলি গ্রামের হিতার্থে ব্যয় করবো, কিন্তু সে কার্য্যের যোগ্য সহায় কোথায়? তাই আমি তোমাকেই চাই। তুমি যদি আমার সহায় হও তা হ'লে আমি এই দেশকে আবার সোণার

দেশে পরিণত কর্‌তে পারবো! বাবা বুড়ো বয়সে এইমাত্র আমার ভিক্ষা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আমার কথা রাখ্‌বে।"

শৈলেন গদগদ স্বরে কহিল, "দাদামহাশয়! আপনার প্রাণ যে এত বড় মহৎ সে কথা ত আমি কোন দিন জান্‌তুম না। লোকে আপনাকে কৃপণ বলে, আপনার মত কৃপণ যেন প্রত্যেক গ্রামে এক একটি জন্মায় তাহা হইলে সে গ্রাম তীর্থে পরিণত হইবে। আপনি আমাদের পরিবারের মান মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন; তার চেয়ে বড় আপনি আমাকে আপনার কার্য্যের সহযোগী কর্‌তে চাইছেন। এ ত কম গৌরবের কথা নয়, কিন্তু এখন আপনাকে কিছু বল্‌তে পারবো না, আমাকে কিছু সময় দিন। আমাকে আবার লক্ষ্ণৌ যেতে হবে—শ্বশুর মহাশয়েরও পরামর্শ প্রয়োজন। তবে আমি এই কথা আজ বলে যাচ্ছি—আমি আপনার কার্য্যের সহায় হব। এর জন্য যদি আমায় দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ কর্‌তে হয় করবো।" এই কথা বলিতে বলিতে শৈলেনের দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। সে মন্ত্রচালিতের ন্যায় বাড়ুয্যে মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি শৈলেনকে আলিঙ্গন করিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা! দীর্ঘ জীবন লাভ কর, দেশের মুখোজ্জ্বল কর।"

তারপর দুইজনে গ্রাম্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এরূপ সময় সহসা একটা ক্রন্দনের রোল শোনা গেল। উভয়ে দ্রুতপদে ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া একটী বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন—একটী যুবক ওলাউঠা রোগে মারা গিয়াছে; অপর একটী স্ত্রীলোকও রোগাক্রান্ত হইয়াছে। বাড়ীর সকলে বিপন্ন, বিশেষ ইহারা জাতিতে নমঃশূদ্র। ইহারা মাত্র এক ঘর এ গ্রামে বাস করে, কে শবদাহ করিবে? আর কেই বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে? দাদামহাশয় তাড়াতাড়ি কয়েকজন লোককে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য ভিন্ন গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। এখন চিকিৎসার কি করা যায়? নিকটবর্ত্তী আট দশ মাইলের মধ্যে কোনও চিকিৎসক নাই। দাদামহাশয় কহিলেন—"দেখ্‌লে ত গ্রামের কি অবস্থা?" শৈলেন বিস্মিত ভাবে নত নেত্রে চাহিয়াছিল। সে মাথা উঁচু করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল—"দাদামহাশয়, আমি কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জানি, এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে আমার ঔষধের বাক্সটা আনান।" তৎক্ষণাৎ একজন লোক ছুটিয়া গেল,—ঔষধের বাক্স আনিলে শৈলেন ও দাদা মহাশয় দুইজনে সমাজের চক্ষে অস্পৃশ্য নমঃশূদ্রের চিকিৎসায় ও সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। শৈলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। তাহার চিকিৎসা

নৈপুণ্যে রোগীর অবস্থা অনেকটা ফিরিয়া আসিল ; রোগীকে একটু সুস্থ দেখিয়া তাহারা উভয়ে বাড়ী ফিরিলেন।

গ্রামের অবস্থা কেমন করিয়া ফিরিতে পারে। দেশের লোক কেমন করিয়া সুখে ও স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকিতে পারে—কি করিয়া তাহাদের শিক্ষাদান করা যায় সে বিষয়ে উভয়ে মিলিয়া অনেক পরামর্শ করিলেন। নানা উপায় স্থির করিলেন, রাস্তা, ঘাট, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমুদয়ের সংস্কার কার্য্য কিরূপ প্রণালীতে অগ্রসর হইবে সে সব পদ্ধতি স্থির হইল। শেষটায় দাদামহাশয় কহিলেন, "শৈলেন! আমি বাল্যাবধি একটী বাসনা মনে পুষে আস্‌ছি, তুমি যদি সহায় হও তাহা হইলে আমার সে বাসনাটী পূর্ণ হয়। কথাটি এই, আমার ছেলেবেলা একবার প্লীহা হয়, জীবন-সংশয়, বিশ মাইল দূরে চন্দনপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয়। আমার এক খুড়িমার পিত্রালয় ঐ গ্রামে ছিল। জল পড়া, হকিমী, আয়ুর্ব্বেদী ইত্যাদি কোন চিকিৎসায় যখন কোন ফল হইল না, তখন মা আমাকে সঙ্গে করে খুড়িমার বাপের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেই সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করান। আমি ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা গুণে অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ কল্লেম। তারপর দাদা, জীবনে ওকালতী করে যথেষ্ট পয়সা রোজগার কল্লেম। মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন মাকে জিজ্ঞেস কল্লুম—"মা, তুমি

আমাকে বড় কষ্ট করে মানুস করেছ, তোমার ত কোন দিন কিছু কর্‌তে পারিনি, আজ তুমি আমাকে একা ফেলে পালাচ্ছ, তুমি আমাকে অনুমতি কর, কি কাজ কর্‌লে তুমি সুখী হবে? মা বল্লেন—'বাবা! ছেলেবেলা তুই যখন ব্যারামে ভুগছিলি তখন সরকারী ডাক্তারখানার অযুধ খাইয়ে তোকে বাঁচিয়েছি। আমার ইচ্ছে করে কি জানিস্—তুই যদি ওরকম একটা সরকারী ডাক্তারখানা আমাদের গাঁয়ে করে দিস্ তা হ'লে দেশের লোকজন গরীব দুঃখী ব্যারাম পীড়ার হাত থেকে বাঁচবে, বিনা পয়সায় ওদের চিকিৎসা হবে। যদি তাই কর্‌তে পারিস্ তা হ'লেই বাবা আমি সুখে মর্‌তে পারি। ওরে হরিপদ, গরীব দুঃখীর দিকে কেউ চায় না। তুই গরীবের সেবা কর্।' বুঝ্‌লে শৈলেন, মায়ের আদেশ এতদিন পূর্ণ কর্‌তে পারিনি, এইবার তোমার সাহায্যে আমি কাজটা সেরে ফেলতে চাই, শরীরের ভালমন্দ আছে ত? আমি পঁচিশ হাজার টাকা ডাক্তারখানার জন্য দিব, তুমি তাড়াতাড়ি তার একটা ব্যবস্থা কর।" শৈলেন অশ্রুভরা নয়নে কহিল—"কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব, সে ভাষা আমার নেই, আপনি প্রকৃতই মহাপুরুষ—আমরা তা জান্‌তুম না। ধন্য আপনি!" শৈলেনকে বাধা দিয়া দাদামহাশয় কহিলেন—"চুপ্ কর্ শালা! এখন কাজটা সেরে ফেল্‌বার

ব্যবস্থা কর্। একেবারে এ যাত্রায়ই সেরে নে।" শৈলেন হাসিয়া কহিল, "খুব রাজি দাদামহাশয়। কালই আমি ছুটির দরখাস্ত করে দিচ্ছি।" বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "নাত্‌বৌ রাগ কর্‌বে নারে শালা ?" শৈলেন মৃদু হাস্যে কহিল—"সে ভাবনার জন্যে আপ্‌নি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি কিন্তু এ কথাটা গোপন রাখ্‌বো না, গ্রাম শুদ্ধ বলে বেড়াব।" বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"ওসব করিস্‌নে ! করিস্‌নে ! কোন কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলে বেড়ান ঠিক নয়।" "আচ্ছা সে বোঝা পড়া আমার আছে।"

পরদিন গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বাড়ুয্যে মহাশয়ের এই দানশীলতার কথায় ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ছোট বড় সকলে এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত "আমাদের গ্রামে ডাক্তারখানা হবেরে" বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল —ইহা শুনিয়া দুই একজন গ্রাম্য মাতব্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"বুড়ো বয়সে বাড়ুয্যের ভীমরতি পেয়েছে ! নাম কিন্‌তে চায় ! নিশ্চয় ক্ষেপেছে ! ডাক্তারখানা কিরে বাপু !"

১৩

শৈলেন চলিয়া গেলে পর নিরুপমা বড়ই একা বোধ করিতে লাগিল—বিবাহের পর যেমন উভয়ের মধ্যে বেশ

ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়া দাম্পত্য-প্রণয়ের প্রথম আকর্ষণটা অনেক দূরে নিয়া টানিয়া ফেলিয়াছিল,—উহা আবার তেমনি পূর্ব্বের সেই ব্যবধানের বাঁধন ছিন্ন করিয়া এমনি দৃঢ় বন্ধনে দুইজনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে নিরুপমা একটা প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া দিনগুলি কাটাইতেছিল। রামচরণবাবু দিন দিনই স্বাস্থ্য হারাইতেছেন, পূর্ব্বের সে বল নাই—সে শক্তি নাই—শৈলেন তাঁহাকে কত দিন বলিয়াছে যে আপনি এখন এ সব ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া দিয়া শেষ দিন কয়টা শান্তিতে অতিবাহিত করুন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিয়াছেন, "সে হয় না বাবা! যে কয়দিন বেঁচে আছি খেটেই যাব।"

কমলকামিনী এখন ভ্রাতার সেবা ও যত্নে অতিরিক্ত মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে,—সে কেন যে তাহার মত বদ্‌লাইয়াছে তাহা তাহার ব্যবহারে বিশেষরূপেই প্রকাশ পাইতেছিল। বিজ্ঞ রামচরণবাবু সমুদয়ই বুঝিতেন, তবু কোন কথা বলিবার কোন প্রয়োজন মনে করিতেন না। একদিন রাত্রিকালে রামচরণবাবু ছাতের উপর শুইয়াছেন, দিনের অসহ্য গ্রীষ্মের পর পূবের হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে, বাগানের রাশি রাশি প্রস্ফুটিত পুষ্পের মৃদু মধু সৌরভ বাতাস বহিয়া আনিয়া দিতেছে,—পঞ্চমীর চন্দ্রের

ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে চারিদিকে উজ্জ্বল—আকাশে মেঘ নাই, অনন্ত নীল গগনমণ্ডলে ফুলের ন্যায় হাস্যময় ও উজ্জ্বল তারকারাজি শোভা পাইতেছে। রামবাবু একটা মাদুরের উপরে শুইয়া প্রকৃতই আরাম অনুভব করিতেছেন; কমল ধীরে ধীরে ভ্রাতার পদসেবা করিতে করিতে কহিল—"দাদা, একটা কথা বল্‌বো ?"

রামচরণবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন, "কি ?"

"না, বিশেষ কিছু নয়, তবে আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে—"

"বেশ ত বল না ?"

"এই ধীরেন বল্‌ছিল যে জামাইবাবু ত আরও চার মাসের ছুটি চেয়ে পাঠিয়েছেন—এ সময়টা তাকে যদি শৈলেনের কাজ কর্‌বার জন্য বড় সাহেবকে বলে দেন তা হ'লে অনায়াসেই ধীরেন একটা বড় কাজ পাবার সুযোগ পায়! কি বলেন ?"

রামচরণবাবু খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"পুতুল কি কখন মানুষ হয় কমল ? আর লেখা-পড়ার কাজ তোমার ছেলে কি করে কর্‌বে ? ও যে একটা আকাট মূর্খ !" বাপ মা ও ছেলের খোঁটা তুলিলে স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রাণে আঘাত লাগে। কমল ভ্রাতার কথায় অত্যন্ত

দুঃখিত হইয়া ক্রন্দনের সুরে কহিল—"এ জন্যেই ত বল্‌তে চাইনি দাদা, তুমি কি ওকে ভালবাস? যদি ভালবাস্‌তে তা হ'লে ও অনায়াসে আজ একটা বড় কাজ কর্‌তো! তুমি ত ওকে দেখ্‌তেই পার না, মায়ের মন বোঝে না, তাই তোমাকে মিনতি কচ্ছিলুম।"

রামচরণবাবু তেমনি ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"ধীরু যদি মানুষ হ'ত তা হ'লে তার একটা ভাল সুবিধে কর্‌বার জন্য সাহেবকে সুপারিস্ কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু সে যে কত বড় মূর্খ তা ত তুমি জান না—বা বুঝ্‌তে পার্‌বে না! এ কান্নার বা অনুযোগের কথা নয়!" কমল ভ্রাতার কথা অন্যায়রূপ বুঝিয়া রাগে গর্ গর্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। স্বার্থান্ধ মানুষেরা এমনি করিয়াই আপনার ভাবে বা লোভে অন্ধ হইয়া পড়ে। ছাতে উঠিবার সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া ধীরেন চুপ্ করিয়া মাতুলের কথা শুনিতেছিল—আর রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল, সেই আজ মাকে বলিয়া কহিয়া মাতুলের নিকট সুপারিস্ করিতে পাঠাইয়াছিল, মায়ের অপমানে সর্ব্বাপেক্ষা তাহার প্রতি মাতুলের এইরূপ হীন ধারণায় তাহার ক্রোধের উত্তেজনা সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, সে অতি দ্রুতপদে মাতার আসিবার পূর্ব্বেই শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। কমলকামিনী

ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই সে কহিল—"মা এত অপমান সয়েও কি তুমি এখানে থাক্‌তে চাও?"

"কোন্ চুলোয় যাবে?"

"যে দিকে দুই চক্ষু যায়।" ধীরেনের এ অভিমানের আর একটুকু নিগূঢ় কারণ ছিল, সে তাহার প্রণয়িনী পার্ব্বতী বাইয়ের নিকট হইতে আজ দুইদিন যাবৎ বিতাড়িত। কাজেই সেই অপমানের ক্রোধটা নানা দিক্ দিয়াই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

"ও সব বাজে কথা রেখে দে, তুই যদি মানুষ হ'তিস্, তা হ'লে কি আর আমার এত অপমান সইতে হ'ত?"

এই ভাবে মাতা পুত্রে বহুক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিয়া শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে, যে করিয়াই হউক শৈলেনকে তাহাদের তাড়াইতে হইবে, এজন্য যত বড় পাপই হউক না কেন তাহার অনুষ্ঠানে তাহারা ত্রুটি করিবে না। কি ভাবে কোন্ পথে অগ্রসর হইলে তাহাদের সুবিধা হয়—দুইজনে মিলিয়া বহুরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া সেই মন্তব্য স্থির করিল। পরদিন ধীরেন তাহার ভগ্নীপতি অক্ষয়কে লিখিল মার বড় গুরুতর পীড়া, তুমি অমলার সহিত চলিয়া এস। রামচরণবাবু ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

১৭

রামচরণবাবু ডাক্তার হইলেও বিষয়ী ও সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার জীবিতকালেই যখন কমল ও ধীরেন নানা ভাবে তাহার মতের বিরুদ্ধে চলিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তখন তাহার মৃত্যু হইলে যে ইহারা একটা বিপ্লব উপস্থিত করিবে তাহা স্থির নিশ্চিত। এ সব নানা দিক্ বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিরুপমা ও শৈলেনের নামে গোপনে উইল করিয়া দিয়াছিলেন,—ধীরেনের জন্য একখানা স্বতন্ত্র ছোট বাড়ী ও তাহার মাতার জন্য একটা মাসহারার বন্দোবস্তও তাহাতে ছিল। এ কথাটা অন্য কেহ না জানিলেও চতুরা কমলের অজ্ঞাত ছিল না, কাজেই কোনরূপে ভ্রাতার মনস্তুষ্টি করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা করিয়া যখন ভ্রাতার হৃদয়ের পরিচয় সে পূর্ণরূপে পাইল তখন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, এ বড় বিষম ঠাঁই—তাহাদের আর কোন আশা নাই। রামচরণবাবু ধীরেনকে বস্তুতঃই প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসিতেন, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে কোনরূপেই তাহার চরিত্র সংশোধন হইল না, কুৎসিত সংসর্গই সে গ্রহণ করিল; সে সময় হইতেই তিনি তাহার উপর বিরূপ হইলেন,

এইরূপ লোককে কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের কোনরূপ অংশী করিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না—কাজেই উইলে কমলের মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ধীরেনের জন্য ঐরূপ সামান্য ব্যবস্থা করিয়া বিষয় সম্পত্তির সম্পর্ক হইতে তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করিলেন। উইলখানা তিনি তাঁহার আফিসের সাহেবের নিকট সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন,—কোনরূপে উহা অপহৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অমলাকে লইয়া অক্ষয় ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে আসিয়া লক্ষ্ণৌ পৌঁছিল। ধীরেন তাহাদিগকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল—আর মাতার পীড়ার কথা যে একটা অছিলা মাত্র তাহা সে পথে উভয়কে কহিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। অমলা তাহাতে গর্জ্জিয়া কহিল—"এমন মিথ্যা খবরের কি দরকার ছিল, সারাটা পথ দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হয়ে এসেছি। সত্যি বল, মামাবাবু, নিরু সব ভাল ত?" "হ্যাঁরে সবাই ভাল আছেন,—এই যে বাড়ী এসেছি। নেমে আয়।" সত্য সত্যই গাড়ী তখন বাড়ীর ফটকের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছিল। তাহাদের এইরূপ আকস্মিক আগমনে সকলেই একটু বিস্মিত হইলেন। অমলা নিরুপমার চেয়ে বয়সে দুই এক বৎসরের মাত্র বড়। বড় হইলেও শৈশব হইতেই দুইজনের বড় ভাব। নিরুপমা এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় অমলাকে পাইয়া

অতিশয় সুখী হইল। আর সত্যসত্যই অমলা বড় ভাল মানুষ ছিল, অতি সরলা ও কর্ম্মকুশলা,—সকলের চেয়ে তার বড় গুণ যে কাহারও কোনও অন্যায় দেখিতে পারিত না। এজন্য তাহাদের স্বামী স্ত্রীতে বনিবনাও হইত না,—অক্ষয় কপট, ক্রূর ও খাঁটি গ্রাম্য সুচতুর বিষয়ী লোক, সে কলে কৌশলে গ্রাম্য-জ্ঞাতি বন্ধুগণকে বঞ্চিত করিয়া নিজের বিষয় সম্পত্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। দশ গ্রামের লোক তাহার কাছে টাকা ধারিত, অধিকাংশ লোকেই কোন না কোন প্রকারে তাহাদের করায়ত্ত ছিল। মোকদ্দমা চালাইতে, মিথ্যা সাক্ষী তৈরী করিতে, মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করিতে সে ছিল অদ্বিতীয়। মিষ্ট কথায় সে সকলের মন ভুলাইতে পারিত, লোকের সহিত মিশিবার গুণ ছিল তাহার অসাধারণ। তার জীবনের সখ ছিল একমাত্র গান বাজনা। সে ভাল গাহিতে পারে বলিয়া তাহার একটু খ্যাতি থাকায় গ্রামের নানা স্থানে যেখানে সঙ্গীতের আড্ডা বসিত সেখানেই তাহার ডাক পড়িত। অক্ষয়ের সহিত শ্বশুরালয়ের বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না—শাশুড়ী ভ্রাতার সংসারে আছেন, সেখানে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দিবার তাহার কোন আবশ্যকই ছিল না। এইবার ধীরেনের পত্রে শাশুড়ীর পীড়ার কথায় বিশেষ অমলার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাহাকে আসিতে হইয়াছিল—নচেৎ সে গ্রামের নানা কাজ শেষ না

করিয়া কখনও এখানে এ সময়ে আসিত না। বহুকাল পরে সকলের দেখা শুনা ও আলাপ পরিচয়ের পরে কমল ও ধীরেন গোপনে অক্ষয়ের কাছে সমুদয় অবস্থা বিবৃত করিলেন। অক্ষয় খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া ডাকিয়া কহিল—"এ আর তেমন কঠিন কাজ কি মা? আচ্ছা আমি যে সব কথাগুলো জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দিন।" কমল উৎফুল্ল মুখে কহিল—"কি বল্‌বে বল বাবা!"

"শৈলেনবাবু কতদিন দেশে গেছেন?"

"এই তিন চার মাস হ'ল।"

"নিরুর কাছে খুব ঘন ঘন চিঠি পত্র দেন কি?"

"লেখে, তবে তেমন হপ্তায় হপ্তায় নয়।"

"নিরু শৈলেনকে চিঠি পত্র কি রকম দেয়?"

"সে অন্ততঃ সপ্তাহে দুইখানা চিঠি লেখে।"

"হুঁ,—আচ্ছা রামচরণবাবু শৈলেনকে আজকাল কি রকম দেখেন?"

"অবশ্যি মাঝে তার মন বিগড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইদানীং জামাইকে ত খুব ভালবাসেন, বিশেষ ঐ ছোঁড়াটা হওয়ার পর থেকে। বাবা যা হয় একটা হিল্লে কর। নইলে ধীরু যে একেবারে ভেসে যায়।" অক্ষয় কহিল—"দেখুন আমি বিষয়ী লোক, সংসারের অনেক দেখেছি, কিন্তু এ দেখ্‌ছি কোন দিকেই

তেমন সুবিধে হ'বে না, বরং খারাপই হ'তে পারে। তবে একমাত্র উপায় স্বামী ও স্ত্রীর মনের ভিতর একটা সন্দেহ জন্মিয়ে দিয়ে দু'জনের মধ্যে যদি একটা বিদ্বেষ জন্মিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লেই সব দিকে সুবিধে হ'বে। রামচরণবাবু হাজার হলেও মেয়ের প্রতি জামাইয়ের অন্যায় ব্যবহার বরদাস্ত কর্‌বেন না, শেষে তার মত পরিবর্ত্তন করে হয়ত ধীরেনের জন্য কোন একটা ব্যবস্থা হ'বে। তা ছাড়া আর তেমন কোন সুযোগও আমি দেখ্‌তে পাই না। ধীরেনকে তিনি আদৌ দেখ্‌তে পারেন না। আর দেখুন সত্য কথা বল্‌তে কি ধীরু সম্পত্তি পেলেও দু'দিনের ভিতরই সব উড়িয়ে দেবে।" কমল একটু মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—"তুমিও এ কথা বল্‌ছো বাবা।"

"বল্‌ছি বই কি—তবে তেমন কিন্তু করে বল্‌ছিনে। আপনিই কি আর এ কথাটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারেন?" কমল চুপ করিয়া রহিল। অক্ষয় কথাটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইবার জন্য কহিল—"আমি নিরুপমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করে যাতে সব দিকেই সুবিধা করে উঠ্‌তে পারি, সে ব্যবস্থা কর্‌বো। আমার যতটুকু সাধ্য কর্‌বো। কিন্তু ধীরু সাবধান! মদ খাওয়া দিন কয়েকের জন্য ছেড়ে দাও।" "যা বল্‌বে মুখুয্যে সব কর্‌বো। আহা! এত টাকা পয়সা বাড়ী ঘর সব যদি হাতছাড়া হয় তা হ'লে আর কোন রকমেই বাঁচ্‌বো না।"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল—"সে ত হ'বে, কিন্তু খবরদার কোন রকমেই যেন এ সব কথা অমলা না শোনে, তা হ'লে মুস্কিল হবে! সে কিন্তু—"

কমলা ইঙ্গিত করিয়া অক্ষয়কে চুপ হইতে বলিল,—সহসা অমলা সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—"তোমরা তিন জনে চুপি চুপি কি কচ্ছো গো? চলনা—আজ একটু সহরটা বেড়িয়ে আসি। নিরুও যাবে, কি বল?"

অক্ষয় কহিল—"বেশ ত!"

সেদিনের মত সেখানেই সভা ভঙ্গ হইল। ধীরে গোপনে যে তুষের আগুনের সৃষ্টি হইল—তাহা বাহিরে কোনরূপেই প্রকাশ হইল না। নিরুপমা বা রামচরণবাবু স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে তাহারই গৃহে তাহারই অন্নে পালিত আত্মীয়স্বজনগণ শান্তির সংসারে আগুন জ্বালাইবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

১৮

অক্ষয় একদিন সন্ধ্যার সময় নিরুপমাকে কহিল—"নিরু! তুমি ত খুব ভাল এস্রাজ বাজাতে পার, কই একটু বাজাওনা শুনি।" নিরুপমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"মিছে কথা মুখুয্যে মশাই। ভুল শুনেছেন।"

"যাও আর ঠাট্টা করতে হ'বে না। লক্ষ্মীটি একটু বাজাও দেখি।"

"আপনি গাইবেন ত? আপনি যদি গান—তবে আমি বাজাব নইলে নয়।"

"দূর আমি কি গাইব, আমি হলেম অজ পাড়াগেঁয়ে, আমাদের ত ভাই কোন রাগরাগিণীর বোধ নেই! কি গাইব!"

নিরুপমা উচ্চহাস্য করিয়া ঈষৎ কোপ কটাক্ষে কহিল, "যান্ যান্ আর ন্যাকামো করবেন না, ভারি ত গাইতে জানেন—বলে এত অহঙ্কার।"

অক্ষয়ও তেমনি ভাবে ব্যঙ্গের সুরে কহিল—"আচ্ছা ঠাক্‌রুণ, আপনার হুকুম তামিল কচ্ছি।" সত্যসত্যই অক্ষয় ভাল গাহিতে পারিত। সন্ধ্যার মৌন ম্লান নিবিড়তার মধ্যে তাহার মধুর সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে গাহিল—

তুমি সন্ধ্যার মত নীরব মধুর গোপন হৃদয়-বিহারী।
আমি কত ভালবাসি এই রূপরাশি বলিতে না পারি!
তুমি কতদূরে কোথা সুনীল গগনে
তুমি কোন্ অতলের জলধি ভবনে
রয়েছ গোপনে ধরিব কেমনে আকুল বেদনা আমারি!

বসন্তের বায়ু শুধু বলে যায়, তুমি আছ, তুমি আছ ওগো!

ও সুন্দরি!

ধরিবারে চাই, ধরিতে না পাই,—এস প্রাণে এস চিত্তহারী।

এস্রাজের করুণ কোমল মধুর স্বরলহরী গানের আকুল বেদনাময় সুরের সহিত বাজিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার হাতের সোণার চুড়িগুলি রিণিকি ঠিনিকি করিয়া তাল দিতেছিল। এলায়িত কেশ পাশ গুচ্ছে গুচ্ছে উড়িয়া উড়িয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বাহুতে ও মুখে পড়িতেছিল। অক্ষয় গাহিতে-ছিল—আর দেখিতেছিল তাহার চিত্ত সত্যসত্যই নিরুপমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। গীত শেষে অক্ষয় হাসিয়া কহিল—"তুমি এত সুন্দর বাজাইতে পার নিরু? এ যে আমি মনেও ভাবতে পারি নাই।" নিরুপমা প্রশংসার আনন্দে প্রীত হইয়া কহিল, "আপনার গলা কিন্তু অতি মিষ্টি—আর গানটির রচনাও তো বেশ। কথার গাঁথুনিগুলি অতি চমৎকার!" অক্ষয় হাসিল—এ হাসি সরল পবিত্র হাসি নয়—গরল মাখা। এ যেন শিকারির শিকার লইয়া ক্রূর হাসি। সরলা নিরুপমার এ সব কল্পনার অগোচর। অক্ষয় এমনি ভাবে ধীরে ধীরে নিরুপমার সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করিতে আরম্ভ করিল। সে তাহার ছেলে ভুলুকে অতিরিক্ত আদর দেখাইতে,—তাহার জন্য খেলার পুতুল কিনিয়া দিতে মুক্ত হস্ত হইয়া উঠিল। আর একটু

সুযোগ পাইলেই সে নিরুপমার সহিত গল্প গুজব করিতে প্রবৃত্ত হইত। অতিবড় সুচতুর ব্যক্তিও অনেক সময়ে দুষ্ট লোকের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সরলা নিরুপমার পক্ষেও এ কথা বিশেষরূপে খাটে। সে অক্ষয়ের মনে যে কোন কু-অভিসন্ধি আছে, সে যে একটা মায়ার ষড়যন্ত্র লইয়া এই কার্য্যগুলি করিতেছে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে এইরূপ কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই। কাজেই অক্ষয়ের সঙ্গে সে অতিশয় খোলা-মেলা ভাবে মিশিতে আরম্ভ করিল। দুপুরের সময় তাহারা দুইজনে খেলিত, গল্প করিত। মাঝে মাঝে দুই এক দিন অমলা আসিয়াও অবশ্য যোগ দিত, কিন্তু অমলার এ সব খেলা-ধূলা বা গান বাজনা ভাল লাগিত না, সে দুপুরের সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করিত কিংবা মাতার সহিত গল্প করিত। কমলকামিনী অক্ষয়ের এইরূপ কৃতকার্য্যতায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল এইবার শিকার জালে পড়িয়াছে! তিনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি বাবা! কত দূর? দাদা জিজ্ঞেস কচ্চেন তোমরা আর কতদিন থাক্‌বে? আমি বলিছি তোমার শরীর ভাল নয় বলেই হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছ, আর দুই এক মাস দেরী হ'বে। তাতে বল্লেন বেশ,—তোমার জামাইটি খুব ভাল পেয়েছ কমল।" অক্ষয় রামচরণবাবুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিত।

তাহার ব্যবহারে ও আচরণে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, আর একটা কথা এই যে আজকাল তাহার শরীর আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, শৈলেন আরও তিন মাসের ছুটি লইয়াছে, তিনি তাহার উপর এজন্য একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। এ সময়ে তাহাকে দেখিবার লোকও ত কেহ নাই। ধীরেনটা ত অপদার্থ, কাজেই এই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সুচতুর যুবকটির উপর তিনি অজ্ঞাতভাবে একটু নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বই কি? অক্ষয় দুই দিক্ বজায় রাখিয়াই তাহার কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছিল। ধীরেনের আর আনন্দ ধরে না, অক্ষয়ের বুদ্ধির প্রশংসা সে আজকাল বন্ধুবান্ধবের কাছে একটু অতিরিক্ত পরিমাণে করিতেছিল। সে বলিত যে শৈলেনবাবু বি, এ, পাস কর্‌লে কি হ'বে? একটা মূর্খ ব্যায়াকুব বই কিছু নয়। আর দেখ্‌তে অক্ষয়বাবুকে এণ্ট্রান্স ফেল হ'লেও কেমন খেলোয়াড় মানুষ। বন্ধুবান্ধবেরা তাহার সাক্ষাতে সায় দিলেও নেপথ্যে যাইয়া বলিত 'বেটা বলে কিরে?'

অমলা নিরুপমার সহিত অক্ষয়ের এরূপ মেলা-মেশা আদৌ ভাল লাগিত না,—কিন্তু সে তাহার এই মনের ভাব এক দিনের জন্যও স্বামীকে বা নিরুপমাকে খুলিয়া বলে নাই। সে বাস্তবিকই বড় ভালমানুষ, কাহারও প্রাণে কোনরূপ আঘাত দেওয়া বা সন্দেহ করা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। তবু অক্ষয়ের

ব্যবহারটা তাহার কাছে ভাল লাগিতেছিল না। অমলাকে তাহার সরলতার জন্য ও নির্ভীকতার জন্য ইহারা সকলেই ভয় করিত। আরও ভয়ের কারণ এই ছিল যে যদি কোনরূপে তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় তাহা হইলে সে প্রকাশ না করিয়া নীরবে থাকিবে না, তবে—তবেই ত সর্ব্বনাশ! অমলা সরলা হইলেও বুদ্ধিমতী—সে স্বামী, মাতা ও ভ্রাতার ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহারা তাহার নিকট কি যেন গোপন করিয়া যাইতেছে। সে বুঝিয়াও তাহা জানিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই।

১৮

দাদামহাশয়ের টাকায় দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইল। নদীর ধারে এক প্রকাণ্ড মাঠের উপর দালান নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। সম্মুখে দীঘি খনন করা হইল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সপত্নীক আসিয়া চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের স্ত্রী-পুরুষেরা আসিয়া এ উৎসব দেখিল ও বাড়ুয্যে মহাশয়ের দানশীলতার জন্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, শৈলেনকে ও বাড়ুয্যে মহাশয়কে কহিলেন, “ইহাই অর্থের যথার্থ সৎ ব্যবহার।” দাদামহাশয় মস্তক নত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “সাহেব, এক

দিন হিন্দু—পুষ্করিণী খনন, কাঙ্গালী ভোজন, রোগীর সেবা এ সকলকে পুণ্য কাজ বলিয়া মনে করিত, এখন আর সেদিন নাই। তোমরা সুদূর সাগর পারের 'হোমের' কথা ভোল না, আর আমাদের মধ্যে যে সকল লোক একটু উঁচু কাজ করেন, যাদের দু'টো পয়সা হয়, তাহারাই পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে ঘর বাড়ী তৈরী করিয়া বাস করেন, পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া যায়। সে সব দেশের লোকের উন্নতি কিরূপে হইতে পারে বলুন ?" সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক্ কথা বলেছেন—ঠিক্ কথা। এ বিষয়ে আমি আমার জেলার জমিদারকে অনেকবার বলেছি।" তারপর শৈলেন সাহেবকে বলিলেন। "দাদামশাই চিকিৎসালয়ের উন্নতির জন্য কেবলমাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হ'ন নাই, গ্রামের রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য, বিদ্যালয়ের জন্য ও স্বাস্থ্যনীতি প্রচারের ব্যবস্থার নিমিত্ত তিনি তাহার স্বোপার্জ্জিত এক লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে সম্মত, আর সে সব কাজ কি করে কর্‌তে হবে, স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে তাহার প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা কর্‌তে চান। এ বিষয়ে আপনি মনোযোগী না হ'লে হবে না, আপনি বিদেশী হলেও আমাদের এ জেলার উপকারের জন্য অনেক কাজ করেছেন। আপনি এ জেলাকে ভালবাসেন ও আমাদের ভাল-

বাসেন তাই আপনাকে এতগুলো কথা বল্‌তে সাহসী হলেম। আমার উপর দাদামহাশয় এ সব কাজ কর্‌বার ভার দিয়ে কাশী চলে যাবেন, এই তাঁর ইচ্ছে। শুধু আমি যতদিন না চাকরী ছেড়ে গ্রামে আসি, সে কয়টা দিন তিনি অপেক্ষা কর্‌বেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আনন্দে বৃদ্ধকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন—"আপনি কি দেবতা না মানুষ? আপনাকে সকলে কৃপণ বলে নিন্দা করেছে! এ রকম কৃপণ যে দেশে জন্মায়,—সে দেশ ধন্য। আমি লাট সাহেবের কাছে আপনার কথা বল্‌বো! ধন্য আপনি।"

দাদামহাশয় কহিলেন—"না না সাহেব ও সব করো না, আমি সামান্য মানুষ। আমার এ কাজের জন্য বাইরের ঢাক ঢোল পেটা হয়, খবরের কাগজে নাম উঠে ও সব আমি চাইনে। দোহাই সাহেব! ও সব কিছু কর্‌বেন না।" সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"সে দেখা যাবে।" তারপর উভয়ের করমর্দ্দন করিয়া সপত্নীক অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। এইভাবে শৈলেন ও দাদামহাশয় গ্রামের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেদিন বিকেলবেলা শৈলেন একখানা চিঠি পাইয়া বিস্মিত হইল! এ যে তার কল্পনার অতীত। চিঠিতে কাহারও নাম ছিল না। তাহাতে লেখা ছিল—"আপনার স্ত্রী পূর্ব্বাপরই ভ্রষ্টা, বিবাহের পর হইতেই তাহার চরিত্রে দোষ ঘটে। কিন্তু

সে কথা কেহ কখনও মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করে নাই। ইদানীং তাহার ব্যভিচারিতা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিতে পারিবেন না। আপনি যদি গোপনে লক্ষ্ণৌ আসেন এবং অন্যত্র থাকিয়া আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিলাম, তাহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমার আপনাকে মিথ্যা কথা প্রচার করিবার কোনও হেতু নাই—কিংবা কোন স্বার্থ নাই।" ইতি আপনার হিতৈষী বন্ধু।

শৈলেন্দ্র নৃত্যের চরিত্রে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এখন নৃত্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—এখন নৃত্য অনুতপ্তা ও প্রকৃতই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সে ধর্ম্ম—সেবা ও পরোপকার। শৈলেন দুই দিন বিমর্ষ চিত্তে চুপ করিয়া ভাবিল, কই আজ প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন যাবৎ নিরুপমার কোন সংবাদও ত সে পাইতেছে না। তবে কি এ কথা ঠিক্? সন্দেহের আগুন তাহার মনে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিল। এ আগুন যেখানে জ্বলে সেখানে মানুষের শান্তি থাকে না; সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়; দেবতা পিশাচ হয়। দেশের কাজে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। এমন সময় এ কি নিদারুণ অভিশাপ! এ কথা যে কাকেও বলা চলে না।

শৈলেন অত্যন্ত বিবেচক, বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল লোক ছিল। সে অবশেষে চিন্তা করিল যে, ইহা কোনও ষড়যন্ত্রের ফল নহে ত? এ ধীরেনের কারসাজি নহে ত? দুশ্চরিত্র ধীরেনের দ্বারা কোন কাজই যে অসম্ভব নহে। নিরুপমা কি কখনও চরিত্র-হীনা হইতে পারে? এ যে অতি অসম্ভব!—অসম্ভব! ভাল কথা দাদামহাশয়ের পরামর্শ লইলে হয় না? তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও তাহার অকৃত্রিম হিতৈষী। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শৈলেন্দ্র তাঁহার পরামর্শ গ্রহণই স্থির করিল। দাদামহাশয়ের বাড়ী ও শৈলেনের বাড়ী পাশা-পাশি। মাঝে সামান্য একটি ক্ষুদ্র বাগান। শৈলেন যখন বাড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে গেল, তখন তিনি গীতা পড়িতেছিলেন। 'গীতা' বাড়ুয্যে মহাশয়ের অতি প্রিয়তম গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতেই তাঁহার মনে কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, এই মহাগ্রন্থই তাঁহাকে বুঝাইয়াছে যে কর্ম্মই ধর্ম্ম; যেখানে কর্ম্ম সেখানেই ধর্ম্ম। কর্ম্ম ব্যতিরেকে ধর্ম্ম আসিতে পারে না। দাদামহাশয় শৈলেনকে দেখিতে পাইয়া পুঁথির পৃষ্ঠার মধ্যে চশমাখানি রাখিয়া হাস্য-মুখে কহিলেন, "এস দাদা এস। এ কি! তোমার মুখ এত মলিন কেন? লক্ষ্ণৌর খবর ভাল ত? বৌমা, ভুলু সব ভাল আছেন ত?" শৈলেন কহিল, "আপনি একটু ভিতরে আসুন! আপনার সঙ্গে আমার একটা গুরুতর পরামর্শ আছে।" বৃদ্ধ

বাড়ুয্যে মহাশয় ত্রস্ত ব্যস্তভাবে অপর কক্ষে যাইয়া বসিলেন, এবং চাকরকে কহিলেন যে এখন যদি কেহ দেখা করিতে আসে তা হ'লে মানা করিস্। তোর দাদাবাবুর সঙ্গে আমার অনেক দরকারী কথা আছে।" ভৃত্য যে আজ্ঞে বলিয়া প্রস্থান করিল।

একখানি তক্তপোষের উপর যাইয়া উভয়ে বসিলেন। তারপর শৈলেন্দ্রনাথ কালকার ডাকে যে বেনামি চিঠিখানা আসিয়াছে তাহা দাদামহাশয়কে পড়িতে দিলেন। তিনি পড়িবামাত্রই লাফাইয়া উঠিলেন এবং অস্বাভাবিক ভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মিথ্যে কথা! ভায়া! এর ভিতর অনেক গুপ্ত রহস্য আছে। তোমার কাছে যে রকম শুনিছি তাতে মনে হচ্চে যে বিষয়ের লোভে কোন দুষ্ট লোক তোমার ও বৌমার মন ভাঙ্গবার চেষ্টা কচ্চে। তুমি দাদা আমার একটা পরামর্শ নাও, লক্ষ্ণৌতে যদি তোমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে, তবে তার কাছে এ চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে সব কথা লিখে দাও,—আর সেখানে কি হচ্চে সব খবর দেওয়ার জন্য লেখ। দেখ কি তার জবাব আসে। তারপর তুমি ও আমি দু'জনেই যাব। স্বামীর যেমন স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা পাপ, স্ত্রীর পক্ষেও তেমনি স্বামীকে হঠাৎ সন্দেহ করা পাপ। বিশেষ এ সব উড়ো চিঠি বিশ্বাস করো না।

আমি নাতবৌকে দেখিছি দাদা—সে কথনও অমন হতে পারে না। এ নিশ্চয় শয়তানের চক্র। তুমি আজই চিঠি লিখে দাও। হঠাৎ কোন কাজ করা ভাল নয়। তুমি মন খারাপ করো না দাদা, জীবনে অনেক দেখেছি—ঠেকেছি—তবে ত শিখেছি।”

সংসারে বিচক্ষণ বৃদ্ধ ব্যক্তি মানুষের সান্ত্বনার স্থল। বিশেষতঃ তরুণদের। সহসা কোন বিপদে বিচলিত হওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি কথনও কাহারও কুৎসা জ্ঞাপনে বিশ্বাস করাও পাপ। একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা স্ত্রীলোকের নিন্দা করাই পরম পৌরুষের কারণ বলিয়া মনে করে। বিপদে ধৈর্য্য, দৃঢ়তাই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। শৈলেন দাদামহাশয়ের পরামর্শ মত কাজ করিল। সে তাহার বন্ধু—অজিত বোসকে পত্র লিখিল। অজিত শৈলেনের সহকারী—সমবয়স্ক, দুইজনে বড় ভাব। অজিত শৈলেনের মত অমিশুক নহে। সে ছোট বড় সকলের সহিতই মিশিত, তাহাতে তাহার কোনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। ধীরেনের ন্যায় মাতালের সহিতও তাহার ভাব ছিল। এমন কি তাহাদের সহিত গণিকালয়ে যাইতেও সে কোন সঙ্কোচ বোধ করিত না। অথচ কেহ কথনও তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করিতে পারে নাই। লক্ষ্ণৌতে সে “রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম” স্থাপন করিয়াছিল। যেথানে রোগী—

যেখানে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, সেখানেই অজিতের সেবা-পরায়ণ হস্ত দেখা যাইত। এই মহাপ্রাণ যুবকটি পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ ছিল। তাহাকে সকলেই ভালবাসিত। অজিত শৈলেনকে দাদার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। সেদিন: অফিসে শৈলেনের চিঠিখানা পাইয়া অজিত স্তম্ভিত হইয়া গেল। কই সে ত কোন সংবাদ রাখে না। রামচরণবাবু আজ কয়েক দিন যাবৎ অফিসে আসিতেছেন না। তাঁহার হৃদরোগটা হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তারপর ধীরেনের সহিত ত রোজই দেখা হয়। এ কি ব্যাপার ? শৈলেন লিখিয়াছে তাঁহার মতামতের উপরই ভবিষ্য জীবন সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। হায়! কামিনী-কাঞ্চন! এতই কি তাহার আকর্ষণ! এই দুই মায়াই না নানা ভাবে মানুষের সর্ব্বনাশ করে।

সেদিন বিকেল বেলা অজিত রামচরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। রামচরণবাবু তখন একখানা লাঠিভর করিয়া বাহিরের বাগানে বেড়াইতেছিলেন, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—অজস্র চামেলি ফুল ফুটিয়া সুবাস ছড়াইতেছে। ভুলু দাদাবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিতেছে। রামচরণবাবুকে অজিত নমস্কার করিলে তিনি প্রতি নমস্কার

করিয়া কহিলেন—"কি হে অজিত! কি মনে করে?" "আজ্ঞে! আপনাকে দেখ্‌তে এলুম! কেমন আছেন!" "এখন আর ভাল মন্দ কি হে! ঘাটে এসে লেগেছে তরণী।" এ কথা কয়টি কহিয়া একটু ক্ষীণহাস্য করিলেন। অজিত বলিল, "তা কেন এখন আরো কয়েকটা দিন বেঁচে যান। শৈলেনবাবুর মত জামাই পাওয়া দুর্লভ।"

"আর শৈলেন, জামাই কি কখন আপন হয় বাবা! আমি বার বার মানা কল্লুম, আর ছুটি বাড়িয়ে কাজ নেই, কই কথা শুন্‌ল কোথা? আবার চার মাসের ছুটি মঞ্জুর করে নিয়েছে।" "আজ্ঞে, তিনি দেশে গিয়ে গ্রামের অনেক ভাল কাজ কচ্ছেন। এই ত কাল খবরের কাগজে দেখ্‌লুম—তাঁকে ও হরিপদ বাড়ুয্যে বলে একজন ভদ্রলোকের দানশীলতার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খুব সুখ্যাতি করেছেন। গ্রামে কোন চিকিৎসালয় ছিল না, তারা দেশে একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় করেছেন। আরও দেশের নানা কাজ কচ্চেন। শৈলেনবাবুর মত মানুষ কি আর হয় মশাই? আপনার মেয়ের বহুপুণ্যের ফল তাই এমন স্বামী পেয়েছেন।" দ্বিতলের একটা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিরুপমা পিতার ও স্বামীর বন্ধুর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। অজিতের শেষ কয়টি কথায় তাহার মুখে আনন্দের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। কোন্ সাধ্বী রমণীর প্রাণ স্বামীর

গৌরবে গর্ব্বিত না হয়। নিরুপমার একটু অভিমানও হইল ; তিনি দেশে কত কি কাজ করিতেছেন, আর আমাকে কিছুই লিখেন না। কেন? কেন এ গোপন। আচ্ছা একবার আসুন, তখন বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার এই অভিমান বেশী দিন টিকিল না। দুইদিন পরেই সে তাহার স্বামীর কাছে প্রাণ ঢালিয়া এক পত্র লিখিল।

অজিত রামবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সহরে বাহির হইল। লক্ষ্ণৌ এক বিচিত্রনগরী। হারুণ উল রসিদের বোগদাদ নগরীর ন্যায় ইহা কত প্রাচীন স্মৃতি লইয়া বিরাজিত। গম্বুজে মিনারে তোরণে মন্দিরে মস্‌জিদে ইহার অতুলন শোভা। রাত্রি হইয়াছে—রাজপথ আলোকমালায় সুসজ্জিত। গীত-মুখরিত নগরী সত্য সত্যই নৃত্যশীল। বাইজির দল সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া সুর ভাঁজিতেছে। একটী বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া যাইতেই পশ্চাৎ হইতে একজন স্ত্রীলোক অজিতকে ডাকিল। অজিত কহিল—"তুমি কি আমায় কিছু বলবে?" "আজ্ঞে বাইজি সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়াছেন। বড় জরুরি কাজ আছে।" অজিত কহিল—"আজ না গেলে হয় না?" "আজ্ঞে না! দৈবাৎ ত আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হ'ল, নতুবা যে আপনার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'তে হ'ত, বড় দরকারি কাজ।" "তুমি কি কিছু জান?"

বাঁদী হাসিয়া কহিল—"তা হ'লে ত হতই বাবু সাহেব। আসুন—আমি যাই বিবিকে গিয়ে খবর দিই।"

"আর খবর দিতে হবে না, চল একসঙ্গেই যাই।" "চলুন।" অজিত বাঁদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গলির ভিতর দিয়া পার্ব্বতী বাইয়ের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী জুতার শব্দ পাইবা মাত্রই দরোজার পর্দ্দা সরাইয়া হাসিমুখে অজিতকে অভ্যর্থনা করিয়া হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া মেজের উপর পুরু বিছানায় বসাইল। পার্ব্বতী বাইয়ের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সে পাঞ্জাব রমণী। লাহোরে তাহার বাড়ী। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে তাহার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনা বশে সে বারাঙ্গনা। এ পথে সে কেমন করিয়া আসিল, সে বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়ার প্রয়োজন এখানে নাই। পার্ব্বতী বাই বারাঙ্গনা,—বাইজী, নৃত্যগীতই তাহার ব্যবসা। বারাঙ্গনা হইলেও সাধারণ বারাঙ্গনার ন্যায় দেহ বিক্রয় তাহার ব্যবসা নহে। সে রূপসী—বয়স পঁচিশের ন্যূন নহে। কিন্তু দেখিলে তাহাকে ষোড়শী বলিয়া মনে হয়। সে গৌরী—প্রস্ফুটিত চম্পক পুষ্পের ন্যায় তাহার গায়ের রং। মুখখানা হাস্যমাখা ঢল ঢল। সে মুখে সর্ব্বদাই হাসি ফুটিয়া আছে। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল—দীপ্তি-মাখা। এক কথায় সে সুন্দরী। যুবাজন চিত্তহারিণী গুণবতী ও রূপবতী। তাহার ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। রাজা-রাজড়া ও

জমিদারের বাড়ীতে তাহার মুজ্‌রা হয়। তাহার রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিবার জন্য অনেকেই উৎসুক। কিন্তু ঝাঁপ দিবার সুযোগ বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। কতজনে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া তাহাকে পাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু পার্ব্বতী তাহাদিগকে ধরা দেয় নাই। বৈঠকে গীত গাহিয়া মুজ্‌রা করিয়া সে এক এক আসরে হাজার দুইহাজার টাকা উপার্জ্জন করিত, বক্‌সিস্ ত ছিল উপরি পাওনা। সে যাহাকে ভালবাসিয়া যাহার সহিত ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এ পথে আসিয়াছিল—সে বহুদিন হইল তাহারি কাছে তাহাকে একেলা ফেলিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছে। আজ সে একাকিনী—পার্ব্বতী আর কাহাকেও প্রাণ দিতে পারিল না। কাজেই সে বেশ্যা হইলেও ধার্ম্মিকা। অজিতকে সে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অজিতের সেবাকার্য্যে সে একজন প্রধান সহায় ছিল; অজিতকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল যে তাহার দানের কথা যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়। এই পুণ্যবতী রমণীর অজস্র অর্থ সাহায্যে কত অনাথা অন্ন পাইত, কত দরিদ্র বালক বিদ্যা-শিক্ষা করিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এত গুণ থাকিলেও তাহার একটা দোষ ছিল, সেটা সংসর্গের দোষ। সে আমোদ ছাড়া থাকিতে পারিত না। ইয়ার বন্ধু না মিলিলে সন্ধ্যা কাটিত না। মদ না হইলে তাহার চলিত না। এ দোষ তাহার সারে নাই।

কাহারও উপদেশে তাহার এ মতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অজিত এজন্য তাহাকে বহু ভৎ‌র্সনা করিয়াছে। তাহার দান তাহারা গ্রহণ করিবে না, এরূপ ভয়ও দেখাইয়াছে, কিন্তু সে বলিয়াছে—"বাবু সাহেব! চিতার আগুনে এ দোষ পুড়িয়া যাইবে, নচেৎ প্রাণের জ্বালা নিবিবে না। মদ খাই কেন জানেন? বাবু সাহেব! পাপের বেদনা ভুলিতে। এ পথ যে কি তা আপনারা পুরুষমানুষ বুঝিবেন না।" ধীরেন পার্ব্বতীর কৃপার ভিখারী। প্রত্যহ ঝড় নাই জল নাই গ্রীষ্ম নাই বর্ষা নাই -সে সন্ধ্যার পর এখানে আসিয়া হাজিরা দিত, মদ খাইয়া ঢলাঢলি করিত, সুরে বেসুরে চীৎকার করিত, কখনও বা উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য করিত, পার্ব্বতী ইহাতে আনন্দ পাইত। মাঝে ধীরেনের মাত্রাটা একটু বাড়িয়া উঠায়—সে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়ের পরামর্শে সে আবার এখানে জুটিয়াছে। পার্ব্বতীর প্রাথমিক সঙ্গীত শিক্ষা কলিকাতায়, কাজেই সে বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিল। বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে ও বাঙ্গালায় কথা কহিতে তাহার বেশ অভ্যাস হইয়াছিল। বাঙ্গালীবাবুদের সহিত সে বাঙ্গালাতেই কথাবার্ত্তা বলিত।

অজিত বসিলে পর পার্ব্বতী তাহার হাতে পানের ডিবাটা তুলিয়া দিয়া কহিল, "বাবু সাহেব! ধীরেন আর তার বোনাই, রোজ সন্ধ্যের পর আমার বাড়ীতে এসে কি যেন একটা মতলব

পাকাচ্ছে। বেনামি করে কোথায় যেন চিঠি লেখে! ধীরেন যদি একা আস্‌ত তা হ'লে তার কাছ থেকে সব কথাই বের করে নিতে পার্‌তুম্—একটু মদ পেটে পড়লেই তার মুখ খুলে যায়। কিন্তু আজকাল সে একা আসে না। আমার মনে হয় ওরা রামবাবুর কোন সর্ব্বনাশ কর্‌বার যোগাড় কচ্চে। আকারে ইঙ্গিতে সে রকমই মনে হয়। সব কথা আমার কাছে বলে না। রামবাবুর কথা আপনি খুব বলেন, আর তাঁর জামাইবাবু আপনার বন্ধু, তাই আমি এ কথাগুলো আপনাকে বল্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, রোজই ভাবি আপনি আমার এখানে খেলার চাঁদা নেওয়ার জন্য একবার আস্‌বেন, যখন আমাকে ভুলেই গেছেন, তখন বাধ্য হয়ে আজ বাঁদীকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছিলুম, ভাগ্যিস্ আপনাকে আজ পথেই পাক্‌ড়ানো গেছে।"

অজিত চুপ্ করিয়া পার্ব্বতীর কথা শুনিল—তাহার মাথার উপর দিয়া যেন একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। এতক্ষণে তাহা থামিয়া গেল। সে যাহা বুঝিতে পারে নাই, শৈলেনের পত্র পাইয়া সে যে মহা সমস্যায় পড়িয়াছিল, এত সহজে যে তাহার একটা সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইবে সে যে তাহার কল্পনাতীত ছিল। অজিত এখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "ধীরেন কি আর কখনও একা আসে না?" "না বাবু সাহেব।"

"বটে—সে ত তোমার খেলোয়া মাছ—একটু হলেই ত তা পার।" "সে কি আর বল্‌তে হয় বাবু সাহেব। সে জন্মেই ত আজ আপনার তলব। আমি ধীরেন বাবুকে বলিছি, ধীরুবাবু! যদি তুমি আমায় ভালবাস, আর যদি আমার ভালবাসা পেতে চাও তা হ'লে একলা এস। সে রাজি হয়ে গেছে। আস্‌বারও সময় হ'য়ে গেল। আপনি পাশের ঘরে যেয়ে চুপ্‌টী করে বসে থাকুন। আজ সব কথা বের করে নেব।" এমন সময় বাহিরে শিকল নাড়ার শব্দ শোনা গেল। পার্ব্বতী কহিল, "আপনি ও ঘরে যান, আমি শিকল টেনে দিচ্ছি। খবরদার কোন সাড়া শব্দ কর্‌বেন না যেন।" অজিত পার্ব্বতীর কথানুসারে পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল। খানিক পরে ধীরেন আসিয়া পার্ব্বতী বাইয়ের শয়ন-কক্ষে আবির্ভূত হইল।

১৯

ধীরেন আজ মনের মত করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছিল। পার্ব্বতী তাহাকে সাদরে হাত ধরিয়া লইয়া পাশে বসাইল। ধীরেন আনন্দে গলিয়া গেল—কি একটা রসিকতা করিতে গিয়াছিল, পার্ব্বতী তাহাতে বাধা দিয়া কহিল, "তুমি যে আমাকে ভালবাস সে আমার বেশ জানা আছে। যে যাকে ভালবাসে সে কি তার কাছে কোন কথা গোপন করে?"

"আমি তোমাকে কবে কি গোপন করেছি পার্ব্বতি !" বলিয়া ধীরেন পার্ব্বতীর হাত দু'খানি নিজের হাতের উপর টানিয়া লইল। পার্ব্বতী কহিল, "তবে একটু গোলাপী নেশার ব্যবস্থাটা করি ? কেমন ?"

"তা বেশ ত !"

"কি জানি ? তুমি আজকাল যে রকম সাধু হ'য়ে উঠেছ, পাছে আবার ধর্ম্ম নষ্ট হয় !"

যে আদর পাইবার জন্য ধীরেনের প্রাণ তৃষিত আজ কিনা অযাচিত ভাবে সে—সে আদর পাইতেছে ! একদিন যে মদ খাইয়া মাত্‌লামি করার দরুণ পার্ব্বতী তাহাকে অপমান করিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতেও ইতস্ততঃ করে নাই, আজ কিনা সেই পার্ব্বতীই তাহাকে মদ খাওয়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ! অন্য লোক হইলেই ইহা অতি সহজে বুঝিতে পারিত, কিন্তু ধীরেন অত বড় বুদ্ধিমান্ ছিল না ; বিশেষ আজ পার্ব্বতীর আদরে সে সব ভুলিয়াছিল। আজ স্বর্গের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত, আর কি সে কোন বাধা মানে ? পার্ব্বতীর ইঙ্গিতে বাঁদী মদের সকল সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। ধীরেন গ্লাসে খানিক মদ ঢালিয়া পার্ব্বতীর মুখের কাছে ধরিয়া কহিল, "বিবি সাহেব ! পিও পিয়ালা।" পার্ব্বতী উহা ওষ্ঠে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া ধীরুকে খাওয়াইয়া দিল। এইরূপ ভাবে

গ্রাসের পর গ্রাস চলিতে আরম্ভ করিল। আজ পার্ব্বতী কেবল-মাত্র মদ্যপাত্র ওষ্ঠের কাছে ছোঁয়াইতেছিল, সে পান করিতেছিল না। ধীরেনের যখন নেশাটা দিব্য জমিয়া আসিয়াছে, তখন পার্ব্বতী সত্য সত্যই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "ধীরু! একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌বো, বল্‌বে?"

ধীরেন গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "কি?"

"তুমি আর তোমার বোনাই কাকে চিঠি লিখ? আর রোজ সন্ধ্যের সময় পাশের ঘরে বসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি পরামর্শ কর?" ধীরেন জড়িত কণ্ঠে কহিল, "সে যে বল্‌তে মানা—তুম্ তা তানা না।" পার্ব্বতী তাহার কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া যাইয়া কোপ-কটাক্ষে কহিল, "এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাস?" "না—না—রাগ করো না পিয়ারি, সত্যি মাইরি আমি তোমায় খুব ভালবাসি—বড্ড ভালবাসি।"

"ভালবাস বলেই ত একটা কথা শুনতে চাইলুম, বল্‌ছো না। যাও—যাও—তোমরা পুরুষ জাতটাই কপট।" ধীরেন হাসিয়া কহিল, "তোমাদের মত নয় বাবা! মায়াবিনীর ঝাড়!"

"বেশ! তা হ'লে আর কষ্ট করে এলে কেন? দূরে গেলেই ত পার।" এ কথা কয়টি পার্ব্বতী এমনি করুণ

বেদনামুখে সুরে বিচিত্র অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল যে ধীরেন একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, সে তেমনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নেশার সুরে কহিল, "তোমাকে কি কিছু আমার না দেওয়ার আছে পার্ব্বতী ? বল, কি কর্‌তে হবে ? এক্ষুণি কচ্ছি, কি জিজ্ঞেস্ কর্‌বে বল, তোমার জন্য যে আমি হাজারবার মর্‌তে পারি ভাই !"

পার্ব্বতী আবার আসিয়া তাহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল, আবার তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ললাটে চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া কহিল, "ধীরেন, ধীরুবাবু, আমি তোমাকে সত্যই বড় ভালবাসি।" ধীরেন পার্ব্বতীর ওষ্ঠে আকুল আবেগে চুম্বন করিয়া কহিল, "আজ দুনিয়া বড় সুন্দর ! না পার্ব্বতী !" "তা বই কি ? এইবার বল না ভাই ! তোমরা দু'জনে কি ফিস্ ফিস্ কর, কাকে পত্র লেখ।" ধীরেন আর এক পাত্র কারণবারি পান করিয়া হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং আগাগোড়া তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিল এবং পকেট হইতে একখানা পত্র ঝপাং করিয়া বাহির করিয়া কহিল, "এই দেখ্, আজও নিরুর স্বামীর কাছে বাঁ-হাত দিয়ে অক্ষয় বাবু কেমন চিঠি লিখেছেন। কোন শালার ধর্‌বার ছোঁবার যো নেই ! শৈলেন শালা আকাট মূক্ষু। অক্ষয়বাবু আমার বোনাই বুঝ্‌লে। একটা Genius (জিনিয়াস্), কিছুদিন চুপ্

করে থাক। বস্ মাস কয়েকের ভিতর মামা বেটার যক্ষির ধনের মালিক হ'য়ে দেদার মজা উড়াব। একেবারে রাজরাণী বানিয়ে দোব তোমায় পেয়ার! Don't care!"

"বেশ ত! নিরুপমা ত তোমার বোন্, তার সর্ব্বনাশ কর্তে তোমার ইচ্ছে হ'ল।"

"এ ত সর্ব্বনাশ নয়, এ যে লাভ, পার্ব্বতী! অক্ষয়বাবু যা বল্ছেন তাইত কচ্ছি! দেখনা কেন মামা বেটা কিনা আমায় ভাল চাকরী না দিয়ে তার জামাইকে দিলে! আমি কিসে তার চেয়ে অযোগ্য! বল না কাকেও পার্ব্বতী! মামাকেও সাবাড় কর্বার ব্যবস্থা হচ্চে।" পার্ব্বতীর চক্ষু দুইটী জ্বলিয়া উঠিল, "বটে! কি রকমে?" "রোজ অষুধের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বিষ মিশিয়ে, ধর্বার ছোঁবার যো নেই!"

"বটে! তুমি ত খুব শেয়ানা।"

ধীরেন আর এক পাত্র মদ খাইয়া কহিল, "আমি শেয়ানা নই বাবা! শেয়ানা হচ্চেন বোনাই, জাঁদ্রেল লোক বাবা! ওস্তাদ লোক!"

"এতে তোমার বোনাইয়ের কি লাভ?"

"তার কি লাভ—সে যে মায়ের কথায় আমার জন্য সব কচ্চে!" পার্ব্বতী হাসিয়া কহিল, "মহাপুরুষ বটে!" মাতাল নেশার ঝোঁকে যে চিঠিখানা বাহির করিয়াছিল তাহা আর

ফিরিয়া পকেটে রাখে নাই। পার্ব্বতী কৌশলে তাহা সরাইয়া ফেলিল। ধীরেন অসংলগ্নভাবে আরও অনেক কথা বলিয়া গেল। সে সব কথা অন্যের নিকট অসংলগ্ন হইলেও অজিতের কাছে বিশেষ সংলগ্ন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। ক্রমশঃ ধীরেন একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে পার্ব্বতী বাঁদীকে দিয়া একটা গাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

অজিত ধীরেনের কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। পার্ব্বতী বাই কৌশলে যে চিঠিখানা ধীরেনের নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিল, তাহাকে তাহা প্রদান করিল। ধীরেনের নিকট হইতে আরও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য—বিশেষ তাহাকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই সে শৈলেনকে লিখিয়া দিল যে, "বেনামী চিঠি ঈর্ষ্যামূলক, তথাপি তাহার এখন আর দেশে থাকা উচিত নহে। সে যেন পত্রপাঠ চলিয়া আসে, সাক্ষাতে সব জানিতে পারিবে।"

২০

অমলা একদিন অক্ষয়কে কহিল, "আর কেন? চল এখন দেশে যাই। আমার বাবু সত্যি সত্যিই ভাল লাগ্ছে না। চল দু'চার দিনের মধ্যেই দেশে পালাই।"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "আমার কি কোন বাধা আছে? মা ছেড়ে দিলেই যে হয়।" কিন্তু ইহা তাহার মনের কথা নহে। অক্ষয় নিরুপমার রূপের ও গুণের মোহে সত্য সত্যই আবদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমে সে যেরূপ মনে করিয়াছিল এখন দেখিল যে নিরুপমা তাহাকে স্নেহ করে বটে, তাহার সঙ্গীতের প্রশংসা করে বটে, সে কতকটা ভদ্রতা ও সমাজের খাতিরে। তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। অক্ষয় কূটবুদ্ধি হইলেও কোন দিন তাহার চরিত্র-দোষ ছিল না। সে টাকা ও বিষয় সম্পত্তি যত ভালবাসিত, স্ত্রীজাতির প্রতি তেমন আকর্ষণশীল ছিল না। এমন কি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত নিজ স্ত্রীর প্রতিও সে ভালবাসা প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু এইবার বিদুষী নিরুপমার সাহচর্য্যে সে আপনাকে বিস্মৃত হইল, সত্য সত্যই নিরুপমার সহিত প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা গল্প বা সঙ্গীতানুশীলন করিলে তাহার ভাল লাগে না। সে কলে-কৌশলে নানাভাবে তাহার পাপ প্রণয় ব্যক্ত করিলেও সরলা নিরুপমা তাহা লক্ষ্য করে নাই বা বুঝিতে পারে নাই। যখন কেবলি ব্যর্থতা আসিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল, তখন সে সত্য সত্যই পাপের ভীষণ সহচর হইয়া উঠিল। নানা ভাবে এই সোণার সংসার ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল। নানা পাকচক্রে সে জালরূপে জড়াইয়া পড়িল। এখন সে যে বীজ

ছড়াইয়াছে, সে পাপের বীজ কিরূপ ভাবে ফুল-ফল প্রসব করে তাহা দেখিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইল। অমলার কথায় সে প্রকাশ্যে বাড়ী যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করিলেও অন্তরে তাহার এ স্থান ছাড়িয়া যাইবার জন্য তেমন আগ্রহ ছিল না।

অমলার কিন্তু আর একদিনও এখানে থাকিতে ইচ্ছা ছিল না। কোন কাজ নাই—স্বামীর সহিতও তেমন সাক্ষাৎ ঘটে না। অক্ষয় দিনের বেলা নানা অছিলায় নিরুপমার সহিতই অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দেয়, রাত্রিতেও প্রায়ই তাহার নিমন্ত্রণ জুটিয়া যায়। ব্যাপারটা যে সে একেবারেই বোঝে নাই তাহা নহে। তবু ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি অমলা কোনরূপেই কোন কথার বিন্দুমাত্রও প্রচারের বা কাহাকেও বলিবার জন্য উন্মুখ হয় নাই। কিন্তু এতদিনে তাহারও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিবার মত হইল, সে আর আপনাকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া কহিল—"চল এখন দেশে যাই।"

কমলকামিনী সেখান দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি মেয়ের কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—"কেন ব্যস্ত হচ্চ মা, আর এ মাসের কটা দিন থেকে যাবি এখন, কেন এখানে কি কোন অসুবিধা হচ্চে ?"

"না হ'লেও দেশ বাড়ী ছেড়ে কত দিন থাকা চলে বল ? আমার আর এখানে ভাল লাগে না।"

"এ বাপু তোর অনাসৃষ্টি ব্যাপার!"

"তা যাই হ'ক মা, দেশেই যাব,—যাতে দু'এক দিনের মধ্যে যেতে পারি সে ব্যবস্থা করে দাও।" সত্য সত্যই অমলার ইদানীং স্বামীর ব্যবহার সন্দেহজনক মনে হইতেছিল, সর্ব্বদা চিন্তাশীল, অন্যমনস্ক! কেন তাহার এইরূপ হইল? আগে ত এরূপ ছিল না! স্ত্রী যেমন অতি সহজেই স্বামীর সামান্য পরিবর্ত্তনও উপলব্ধি করিতে পারে, স্বামী তেমন পারে কিনা সন্দেহ। অমলা সেদিন মাতা ও স্বামীর নিকট দেশে যাইবার জন্য অতি মাত্রায় জেদ্ করিয়া বসিল। নিরুপমার ছেলে 'ভুলু' এ কয়দিনে মাসীমার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, বন্ধ্যা অমলা তাহাকে এত বেশী স্নেহ করিত যে শিশু মায়ের চেয়েও এই নূতন অতিথি মাসীমার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। ভুলু মাসীমার খোঁজে আসিয়া মাসীমার মুখে তাহার দেশে যাইবার কথায় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"মাসীমা! তুই আবার দেশে যাবি কি? দেখে জানা আজ কাকাতুয়াটা কেমন কচ্চে? চল্"—এই বলিয়া বালক অমলাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। অমলা চলিয়া গেলে অক্ষয় কহিল—"মা! এখন দেখ্‌ছি অমলা সব মাটি করে দেবে? কাজটা ত অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, আমি চলে গেলে সব ভেস্তে যাবে।"

কমলকামিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"সে কি হয় বাবা! তুমি কি এখন যেতে পার! ভাল কথা বাবা! অষুধে ত তেমন ফল হচ্চে না,—শেষটায় যদি একটা হ্যাঙ্গাম বাঁধে।"

"কিছু ভয় কর্‌বেন না,—জান্‌বার কোন হিল্লে রেখে অক্ষয়শর্ম্মা কাজ করে না।"

"তা বেশ বাবা! বেশ! সাত জন্ম তপস্যা করে তোমার মত জামাই পেয়েছি।"

এমন সময় বাহির হইতে রামধনিয়া আসিয়া কহিল, "বাবুজি! আপনাকে বাবু ডেকেছেন। এক্ষুণি আসুন।"

"চল যাই"—অক্ষয় বাহিরে চলিয়া গেল। কমলও কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইল।

অক্ষয় বাহিরে আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানা ঘরে ডাক্তার প্যায়ারী মল ও অজিত বোস্।

অজিত অক্ষয়কে দেখিয়াই নমস্কার করিয়া কহিল—"আসুন অক্ষয়বাবু! অক্ষয়ও প্রতি নমস্কার করিয়া তাহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। ডাক্তার প্যায়ারী মল বিলাত ফেরত প্রবীণ ডাক্তার, তাঁহার হাতযশঃ ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। লক্ষ্ণৌ সহরে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। প্যায়ারী মল বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বাবুকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—

"আমি আশ্চর্য্য হচ্চি রামবাবু! আপনার ত কোন improvement হয় নি। এ অষুধে যে না হয়েই পারে না। আর আপনার শরীরে বিষের ক্রিয়া হচ্চে, খুব slow poison সে জন্যেই আপনি দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন। ডাক্তারের কথায় অক্ষয়ের বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে হঠাৎ পার্শ্বস্থিত একটা ইজি চেয়ারের উপর ধড়াস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অজিত তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—"রামবাবুকে অষুধ খাওয়াবার ভার কার উপর বল্‌তে পারেন?" রামবাবু অক্ষয়ের উত্তরের পূর্ব্বেই কহিলেন—"কমল আর অক্ষয়ের উপরই আমার সেবা শুশ্রূষার ভার। আর দেখ অজিত—অক্ষয় আমার জন্য যথেষ্ট কচ্চে। সকল সময় আমার সুখ সুবিধার সন্ধান নেয়।" অজিত কহিল—"বটে!" ডাক্তার প্যায়ারী মল কহিলেন—"ঔষধের শিশিটা এনে দিন্ ত—আমি সঙ্গে নিয়ে যাব, ওটার রাসায়নিক বিশ্লেষণ কর্‌তে হবে, আমার মনে সন্দেহ হচ্চে যে ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ ভালরূপ তৈরী হয় না!" ডাক্তার ঘড়ি দেখিয়া কহিলেন—"উঃ অনেকটা সময় গেছে, দয়া করে শিশিটা এনে দিন্।" অক্ষয় ঔষধের শিশি আনিবার জন্য তড়াক্ করিয়া উঠিতেই অজিত তাহার পকেট হইতে শিশিটা বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে দিয়া কহিল—"আপনাকে আর কষ্ট করে ওটা আন্‌তে

হবে না, আমি আগেই রামধনিয়াকে দিয়া উপর থেকে ঔষধটা আনিয়েছিলুম।" ডাক্তার মল তাহার হাত-ব্যাগের ভিতর শিশিটা ভরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অজিতকে কহিলেন—"মিঃ বোস্, আপনি বিকালে আমার ওখানে যাবেন, আমি রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল আপনাকে বলে দোব।"

"যে আজ্ঞে।"

রামবাবু উদাসীনের মত অক্ষয় ও অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অজিত তাঁহাকে পূর্ব্বেই এ সব বিষয়ের আভাস দিয়াছিল। রামবাবু কাহাকেও কোন কথা কহিলেন না—যেন কিছু হয় নাই এই ভাবে কহিলেন, "বাবা অক্ষয়! আমার শরীরের অবস্থা বড়ই খারাপ বোধ হচ্চে। তুমি শৈলেনকে একটা খবর দিতে পার?"

"যে আজ্ঞে! আপনার পথ্যটা পাঠিয়ে দিইগে; কেমন?" "দিও হে! আচ্ছা, তুমি একবার নিরুকে এখানে আস্‌তে বল!"

"আচ্ছা!" অক্ষয় তখন সেখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই সে সেখান হইতে উঠিয়া আসিল। যাইবার সময় অজিত তাহাকে নমস্কার করিলেও সে প্রতি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল।

অজিত রামবাবুকে অনুচ্চস্বরে কহিল—"গিরিশবাবু! কি কথাই লিখেছেন—রামবাবু! উজ্জ্বলায় সকলি সম্ভবে।" রামবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"ভায়া হে! কামিনী-কাঞ্চন! কামিনী-কাঞ্চন! তুমি বিকেলে আস্‌তে ভুল না যেন!"

"সে কি হয় মশাই!" বলিয়া অজিত চলিয়া গেল। রামবাবুও একাকী নীরবে ধূম পান করিতে করিতে একরাশ ভাবনা মাথায় লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি এত বড় একটা ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের কথা কল্পনায়ও মনে করিতে পারেন নাই। পৃথিবীতে যাহার উপকার করিবে, যাহার জন্য প্রাণ দিবে সেই কিনা শেষটায় কাল-সাপের মত বিষ-দাঁতের আঘাত করিবে। কি ভয়াবহ বিচিত্র এ সংসার! চমৎকার!

২১

শৈলেন এক সঙ্গে অজিতের ও নিরুপমার পত্র পাইল। নিরুপমা মাত্র কয়েক ছত্র লিখিয়াছে, তাহার ভিতরই কত না অভিমান কত না বিরহ-বেদনার চিত্র, আর চারিদিকে যাহার যশঃ ছড়াইতেছে, লোকে যাহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে, তাহার সেই প্রাণপ্রিয়তম স্বামী কিনা তাহাকে ভুলিয়া এতদিন দূরে থাকিতে পারে? তারপর অমলা দিদির কথা, অক্ষয়ের কথা

ইত্যাদি সবই তাহাতে আছে। ভাল করিয়া ভাষায় না ফুটিলেও পত্রান্তরালে প্রস্ফুটিত সুরভি কুসুমের ন্যায় তাহার প্রণয়-সৌরভ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আর অজিত তাহাকে পত্রপাঠ চলিয়া যাইতে লিখিয়াছে।

শৈলেন দুইখানি চিঠিই দাদামহাশয়কে দেখাইলেন। তারপর দুইজনে পরামর্শ করিয়া নৃত্য ও সুষমাকে দাদা-মহাশয়ের বাড়ীতে রাখিয়া শৈলেন সেদিনই লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিল।

ঠিক্ রাত্রি দশটার সময় সে লক্ষ্ণৌ আসিয়া পঁহুছিল। ষ্টেশনে বন্ধুবর অজিতচন্দ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন, শৈলেনকে লইয়া বাসায় অজিত উপস্থিত হইল।

অজিত লোকটা লক্ষ্মীছাড়া—কোন্ যুগে অর্থাৎ প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী মারা গিয়াছে আর সে বিবাহ করে নাই। ঠাকুর ও চাকর লইয়া তাহার সংসার। পাঁড়েজী উভয়ের খাওয়ার দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল, আহারাদির পর শৈলেনের কাছে সে একে একে সব কথা প্রকাশ করিল। পার্ব্বতী বাইয়ের বাড়ীর ইতিহাস, অক্ষয়ের কীর্ত্তি এবং ধীরেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বেনামি চিঠিখানি শৈলেনকে প্রদর্শন করিল। শৈলেন খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলে—অজিত কহিল—"ভাব্‌ছো কি? রূপসী স্ত্রীকে ওরকম ভাবে ছেড়ে গেলে অনেকেরই লোভ পড়ে! অক্ষয়টিত নিরুপমার জন্য একেবারে

মরিয়া হয়েছে, তবে কাণমলা ছাড়া এ পর্য্যন্ত বেচারার আর কোন লাভ হয় নাই। যাক্ এসব বাজে কথা, কাল সব ব্যাপার ফাঁসিয়ে দিতে হ'বে। তুমি এখানে এসেছ এ কথাটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। আমি ওদিকে আবার রামবাবুকে দিয়ে অক্ষয়কে তোমায় এখানে আস্‌বার জন্য খবর দিতে বলেছি। বুঝ্‌লে গবচন্দ্র!" তারপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া সংসারের নানা কথা তর্ক বিতর্ক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল। বন্ধুত্ব জগতে অমূল্য রত্ন। প্রকৃত বন্ধু সংসারে অতি বিরল। স্বার্থের জন্য সকলেই সকলকে ভালবাসে, কিন্তু প্রাণ দিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে কয়জনে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে? তাহা হয় না বলিয়াই সংসারে এত বিপদ এত জঞ্জাল—এতবড় স্বার্থপরায়ণতা।

অজিত চারিদিকেই বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিয়াছিল। যাহাতে অক্ষয় কোনরূপে পালাইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য তাহার সতর্ক-দৃষ্টি ছিল। অক্ষয় এত খবর রাখিত না। যে ধীরেনের জন্য কমল ও অক্ষয় এতটা ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, সে এখন পার্ব্বতী বাইয়ের প্রেমে মস্‌গুল। সন্ধ্যা হইলেই তাহার আর দেখা নাই। বাড়ীতে কখন কি পরামর্শ হয়, সব কথা সে পার্ব্বতীকে বলে। পার্ব্বতীর সাহায্যে সে সব কথা আবার অজিতের কাণে আসে।

ঠিক্ সন্ধ্যা অতীত হইলেই পরদিন দুইবন্ধু পার্ব্বতী বাইয়ের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী বাইয়ের বাড়ীর নিম্নস্থ কক্ষে দারোগা সাহেব কয়েকজন পাহারাওয়ালা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শৈলেন ও অজিত পঁহুছিবা মাত্রই পার্ব্বতী দুইজনকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করিয়া লইল। শৈলেন্‌কে পার্ব্বতী আর কখনও দেখে নাই,—সেও জীবনে আর কোনদিন এরূপ স্থানে আইসে নাই। পার্ব্বতী বহুক্ষণ একলক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—"বাবু-সাহেব! আপনার মত সুন্দর পুরুষ দুনিয়ায় বড় কম মিলে!"

অজিত হাসিয়া কহিল—"কেন পছন্দ হয়েছে নাকি?"

"পছন্দ হলেই বা মিলে কোথায়?" খানিকটা হাসির রোল বহিয়া গেল। অজিত যেরূপ নিঃসঙ্কোচভাবে এখানে কথা বার্ত্তা বলিতেছিল কিংবা পান চিবাইতেছিল, শৈলেন তাহা পারে নাই। সে আড়ষ্টভাবে ফরাশের একপাশে চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার কাছে এ দৃশ্য নূতন। সে অবাক্ হইয়া গৃহসজ্জা দেখিতেছিল। রূপের পশরা লইয়া যাহারা দোকান সাজায় তাহাদের যে বাহ্যিক আড়ম্বরটা কত বড় প্রয়োজন এ গৃহে সে সকলের কোনও অভাব ছিল না। পার্ব্বতী বহুক্ষণ নানা কথা কহিল। ঠিক্ রাত্রি দশটা বাজিতেই বাহিরে শিকল নাড়ার শব্দ শোনা গেল। বাঁদী দরোজা খুলিয়া দিতে নীচে চলিয়া

গেল। অজিত শৈলেনকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আজ একা ধীরেন নয়, অক্ষয় ও দাওয়াই-খানার কম্পাউণ্ডার সাহেবও উপস্থিত। পার্ব্বতী মধুর হাস্যে তিনজনকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। তাহারা তাহাদের গুপ্ত পরামর্শের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। পার্ব্বতীর ইঙ্গিতে বাঁদী মদ্যপানের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। অক্ষয় ফরাশে বসিয়া পার্ব্বতীকে কহিল—"আদাব বিবিসাহেবা!" পার্ব্বতী মধুর হাসির সঙ্গে মাথা দোলাইয়া "আদাব বাবুজী" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। অক্ষয় কহিল—"আপনার পাশের ঘরটা খুলে দিন। আমাদের আজ একটা জরুরি পরামর্শ আছে।" ধীরেন মদ্যের সরঞ্জাম আসিয়া পঁহুছানর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সদ্ব্যবহার করিতে-ছিল। অক্ষয়ের কথায় পার্ব্বতী কহিল—"আমার বাড়ীতে আপনারা রোজই ফিস্ ফিস্ ফুস্ ফাস্ করেন, অথচ আমাকে গোপন কচ্চেন, কেন? আমাকে কি বিশ্বাস করেন না?"

অক্ষয় কহিল—"সে কি কথা বিবিসাহেবা, নিশ্চয় বিশ্বাস করি, নইলে তোমার এখানে আসি কেন?"

"না, বাবুজী আমায় বিশ্বাস করেন না!"

ধীরেনের মাথায় তখন সুরার লোহিত-তরঙ্গ রঙ্গে-ভঙ্গে নৃত্য করিতেছিল, সে জড়িত কণ্ঠে কহিল—"নিশ্চয় পার্ব্বতীকে

বিশ্বাস করেন না, আমার জানকে—কলিজাকে বিশ্বাস কর কোথায় মুখুয্যে ? যদি পার্ব্বতীর কাছে সব বল্‌তে,—তবে সে অনেক বুদ্ধি বাত্‌লে দিতে পার্‌ত।"

অক্ষয় মনে মনে প্রমাদ গণিতেছিল—তাহার অবস্থা কতকটা যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোরের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কম্পাউণ্ডার সাহেবও নীরবে বসিয়া মদের সদ্‌ব্যবহার করিতেছিল। সে ধীরেনের কথায় সায় দিয়া বলিল —"ঠিক্ কথা! পার্ব্বতীকে এখনও সব খুলে বলুন।" কালো পর্দ্দার আড়াল দিয়া দুইটি তীব্র চক্ষু অতি সংগোপনে ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। অন্য কেহ সে দিকে লক্ষ্য না করিলেও পার্ব্বতীর চক্ষু তাহা এড়ায় নাই। অক্ষয় মহা সঙ্কটে পড়িল। ও দিকে কম্পাউণ্ডার ও ধীরেন মদে দিব্য তৈরী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা জড়িত স্বরে কেবলি বলিতেছিল— "বলনা অক্ষয়বাবু, পার্ব্বতীকে সব কথা খুলে বল।" কম্পাউণ্ডার কহিল—"শেষটায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি! টাকার লোভে এবার দফারফা হ'বার যোগাড় হল দেখ্‌তে পাই! কি বল বিবিসাহেবা ?"

পার্ব্বতী কহিল—"আমি ত মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! আমি কি কিছু জানি? আমায় কি তোমরা কথ্‌খনো কিছু বলেছ ?"

এইবার দুই মাতাল অক্ষয়কে কহিল—"বল না হে বিবি-সাহেবাকে—সব বল না? যা হয় একটা ফন্দী ঠিক্ হ'বে।" অগত্যা অক্ষয় একে একে সব কথা পার্ব্বতীর নিকট বলিয়া যাইতে লাগিল, সে আর কোন বিষয় গোপন করিল না। মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন সে অতি হীনজনেরও সাহায্যপ্রার্থী হয়। অক্ষয়ের কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কহিল—"এতটা কর্‌তে গেলেন কেন? আপনার কি লাভ?" বেহায়া অক্ষয় নিরুপমার প্রতি তাহার যে আকর্ষণটুকু তাহাও বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিল না। পার্ব্বতী ক্রোধের সহিত কহিল—"আপনারা মানুষ না পশু,—আর আমি ত মনেও ভাব্‌তে পারিনি যে আমার বাড়ীতে বসে আপনারা এই ভাবে একজনের সর্ব্বনাশের চেষ্টা কচ্চেন? এ ফ্যাসাদে যে আমাকেও জড়িয়েছেন! পুলিশ যদি শুন্‌তে পায় তা হ'লে আমাকেও যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে বিপদে ফেল্‌বে। আর রামবাবুর মত 'বম্ ভোলানাথ' বাবুজিকে মেরে ফেল্‌বার জন্য এত চেষ্টা কেন? তাতে কি লাভ হ'ত? মনে কিছু কর্‌বেন না! আপনি একটী আস্ত বাঁদর।" কম্পাউণ্ডার ও ধীরেন দুইজনে জড়িত স্বরে কহিল—"বাঁদর নয় বিবিসাহেবা, আস্ত হনুমান।"

বাহির হইতে কর্কশ স্বরে কে বলিয়া উঠিল—"এই যে আমরা সব জাম্বুবানের দল!" এইরূপ বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই

তাহারা দেখিতে পাইল যে দারোগাসাহেব সদলবলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। অক্ষয়ের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দারোগা সাহেবের ইঙ্গিতে পলকমধ্যে প্রহরীরা অক্ষয়, ধীরেন ও কম্পাউণ্ডারের হাতে হাতকড়ি পরাইল। শৈলেন ও অজিত সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র অক্ষয় কহিল—"অজিতবাবু! আপনার এই কাজ?" অজিত হাসিয়া কহিল—"অন্যায় কাজটা কি বলুন? আর দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ইনিই শৈলেন মুখুজ্যে নিরুপমার স্বামী—আপনার প্রেমের জগৎসিংহ। দেখুন অক্ষয়-বাবু! ধীরেন আহাম্মুক, লম্পট, মাতাল, তার জন্যে এতটা না কর্‌লেই ত হ'ত। আর আপনি দূর থেকে এসে, এতটা জড়িয়ে পড়্‌লেন কেন?" অক্ষয় নীরব রহিল। তাহার মুখ দিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

* * * *

দায়রার বিচারে সকলের অপরাধ সাব্যস্ত হইল। নানা-রূপ কৌশল করিয়া কমলকে এ সব ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে রক্ষা করা গিয়াছিল। রামবাবু তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছেন। অমলা তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। অক্ষয়, ধীরেন ও কম্পাউণ্ডারের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। পার্ব্বতী বাই সমুদয় টাকা পয়সা 'রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে' দান করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সে সন্ধান আর কেহ রাখে না।

নিরুপমা স্বামীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদয় অবস্থা শুনিয়া ঊর্দ্ধদিকে হাতযোড় করিয়া কহিল—"দয়াময়! সাতজন্ম তপস্যা করিয়া তোমার মত স্বামী পাইয়াছিলাম,—উঃ কি বিপদের হাত থেকেই আমি রক্ষা পেয়েছি। আমি ত ভুলে কল্পনাও কর্‌তে পারি নাই যে, অক্ষয় এমন পাপ অভিসন্ধি বুকে করিয়া আমার সঙ্গে মেলা মেশা করেছে, আমি যে তাহাকে সহোদরের ন্যায় মনে করতেম।"

শৈলেন হাসিয়া কহিলেন—"শাস্ত্রকারেরা যথার্থই লিখেছেন যে স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস কর্‌তে নেই! ঠিক্‌ কথা নয় নিরু?" নিরুপমা হাসিয়া কহিল—"আর ঠাট্টা কর্‌তে হবে না।" এই ভাবে বিনা আয়োজনে বিনা বাদ প্রতিবাদে দুইজনের মিলন হইয়া গেল। 'ভুলু'বাবু বহুদিন পরে বাবাকে দেখিয়া প্রথম প্রথম মিশিতে চাহেন নাই। দূর হইতেই উঁকিঝুঁকি মারিয়াছেন। ধরা দেন নাই, শেষটায় কিন্তু পিতার প্রলোভনময় খেলনার লোভে ও স্নেহ-মধুর আহ্বানে আর ধরা না দিয়া পারিলেন না।

শৈলেন একদিন অজিতকে ধরিয়া লইয়া তাহার শয়নকক্ষে যাইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই! পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় তুমি আমার ভাই ছিলে, নচেৎ কে এমন করে? ধন্য তুমি! নিরু অজিতকে প্রণাম কর! নিরু গলায়

আঁচল জড়াইয়া অজিতকে প্রণাম করিতে আসিলে, অজিত দূরে সরিয়া যাইয়া কহিল—"দিদি! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জন্মে জন্মে পতিসোহাগিনী ও চির-আয়ুষ্মতী হও।"

*   *   *   *   *

রামবাবু আর স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। এক দিন পবিত্র ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সকলের সম্মুখে সজ্ঞানে অমরধামে চলিয়া গেলেন। মহা ধূমধামের সহিত নিরুপমা তাঁহার শ্রাদ্ধ করিল। শৈলেন ও নিরুপমা প্রচুর নগদ সম্পত্তির অধিকারী হইল। শৈলেন চাকরী ছাড়িয়া দিল। লক্ষ্ণৌএর বাড়ী ঘর ব্যবসা সম্পত্তি দেখিবার ভার অজিতের উপর পড়িল। সকলে শুনিয়া অবাক্ হইল যে, রামবাবু প্রায় আট লক্ষ টাকার নগদ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কণ্ট্রাক্টারী ইত্যাদি নানারূপ ব্যবসায়ে তাঁহার এইরূপ প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল। অজিত নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইয়াও যখন বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, তখন সে বাধ্য হইয়াই তাহাদের লক্ষ্ণৌএর সমুদয় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দেখিবার ভার গ্রহণ করিল। শৈলেন সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া দেশে দাদামহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিল। তিনি শৈলেন, নিরুপমা ও ভুলুকে পল্লীবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। গ্রাম্য নরনারী আনন্দের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। নিরুপমা

সুষমার ও নৃত্যের পদধূলি গ্রহণ করিলে, তাহারাও প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে বরণ করিয়া লইলেন। শৈলেন ভ্রাতার চরণ স্পর্শ করিয়া তাহার মৃত্যুশয্যায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে ভুলিল না। সে ভ্রাতৃ-বধূকেই সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দিল।

২২

শৈলেন যে সহরের সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা তুচ্ছ করিয়া পল্লী-গ্রামে আসিয়া বাস করিবে, এ কল্পনা গ্রামের লোকেরা করে নাই। নিরুপমার কাছে পল্লীর স্বাধীনতা বড়ই ভাল লাগিল। এইবার দাদামহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শৈলেন গ্রাম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা একদিন এক বৈঠকে গ্রামের ভদ্র, অভদ্র সকলকে আহ্বান করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলে অনেকে নানা আপত্তি তুলিতে লাগিল, শেষটায় দাদা-মহাশয়ও শৈলেনের বিনয়-নম্র ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। শৈলেন সকলকেই নিজ নিজ বাড়ীর সংস্কারে জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী সংস্কার ইত্যাদির জন্য অনুরোধ করিল। যাহারা দরিদ্র, অর্থহীন তাহাদিগকে সে নিজব্যয়েই পুষ্করিণী সংস্কার করাইবার ভার গ্রহণ করিল। গ্রামের খালগুলি খনিত হইল, ইহাতে বারমাস গ্রাম্য আবর্জ্জনা সমূহ ধৌত হইয়া পরিস্কৃত হইবার ব্যবস্থা হইল।

শৈলেন পিতার নামে 'দীননাথ বালিকা পাঠশালা' নামক একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা বালিকাদিগকে ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা দানের সহিত শিল্পকার্য্য, গৃহকার্য্য, রন্ধন, স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল মহিলারা বাড়ী বাড়ী যাইয়া বর্ষীয়সী মহিলাদিগকে কেমন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, কি করিলে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্র দ্বারা এই সকল বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দাদামহাশয় নিজে কথকতা দ্বারা গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে, ইতর সাধারণের কাছে, শিক্ষার উপকারিতা, দেশের সেবা ও পল্লীর সেবার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতির বিষয় সকল ভাষায় মনোজ্ঞরূপে বলায় গ্রামের লোকে ধীরে ধীরে তাহাদের আজন্মপোষিত হিংসা ও দ্বেষ ভুলিয়া যাইয়া দেশের কল্যাণার্থ আত্মশক্তি নিয়োজিত করিলেন।

গ্রাম্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য একটী যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে গ্রাম্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা হইল। যে সকল গ্রাম্য-যুবকগণ নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় কাল কাটাইত, তাহারা কাজের সুযোগ পাইল।

একটী মুদ্রা-যন্ত্র ক্রয় করিয়া 'গ্রাম্যবার্ত্তা' নাম দিয়া শৈলেন্দ্র নিজের সম্পাদকতায় একখানি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা ছাপাখানার কাজ জানিত না, যাহাদের সামান্যমাত্র অক্ষর পরিচয় ছিল, তাহারা মুদ্রা-যন্ত্রের কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে গ্রামের সংস্কার চলিতে আরম্ভ করিল।

অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করিয়া বহু কৃষককে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিলেন। সুষমা, নিরুপমা ও নৃত্য, দাদামহাশয় ও শৈলেন্দ্রনাথের কার্য্যে নিজ নিজ শক্তির দ্বারা মহিলাগণের শিক্ষার ভার লইলেন।

যে গ্রামে একদিন জনহীন, নির্জ্জীব পতিত ছিল, আজ তাহা নবীন শ্রী ধারণ করিয়াছে। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সুন্দর বাড়ীটি, চিকিৎসালয়ের সৌধশ্রেণীর ছায়া নদীর স্বচ্ছবুকে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। ছেলেদের ক্রীড়া কোলাহল, গোচারণের মাঠের বিস্তৃত সবুজ সুন্দর ঘাসের মধ্যে গোশ্রেণীর বিচরণ সত্য সত্যই ছবির মত দৃশ্যমান্। সুরপুর সত্য সত্যই সুরপুরে পরিণত হইয়াছে। মহিলারা দিবা দ্বিপ্রহরে এখন আর অলস নিদ্রা বা ক্রীড়া কৌতুকে সময় কাটান না, তাহারা কেহ নব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ম্মিত চরকাতে সূতা কাটেন, কেহ বা চিত্র বা সূচীর কার্য্য

করেন, কেহ বা সারগর্ভ গ্রন্থ অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করেন।

যাহারা দেশ ছাড়িয়া প্রবাসী হইয়াছিলেন, তাহারাও একে একে আবার দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দাদামহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এখন বিভাগীয় কমিশনার, একবার সফরে আসিয়া সুরপুরের নবশ্রী দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া গেলেন, এবং এই আদর্শ পল্লী প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

আবার বৎসর পরে পূজা আসিয়াছে। নীল নির্ম্মল আকাশ। সেফালি পুষ্পের অম্লান মাধুরী চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে। স্বর্ণশস্যে বসুন্ধরা শ্রীশালিনী। মা আসিয়াছেন —ঢাকের তুমুল ধ্বনি চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত। শৈলেন্দ্রনাথের নূতন বাড়ীতে পূজা হইতেছে। দেশের যত কাঙ্গাল ভিখারীকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ভিখারী, অন্ধ, আতুর যে আসিতেছে, তাহাদের সকলকেই দাদামহাশয় ও শৈলেন সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইতেছে, কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অজিত লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান করিতেছে।

শত শত কাঙ্গালী আহারে বসিল। সকলে বিস্ময়ের

সহিত দেখিল—নিরুপমা নিজ হস্তে পরিবেশন করিতে আসিয়াছে, কাঙ্গালীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল! গ্রামের লোকে আনন্দে ও উৎসাহে তাহাদের সহিত আবার জয়ধ্বনি করিল। দাদামহাশয়, গর্ব্বে ও প্রীতিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“এই ত বাঙ্গালীর বধূ, গৃহলক্ষ্মী—পল্লীরাণী নাতবৌ! তুই আমাদের **পল্লীরাণী**।”

*　　*　　*　　*　　*

এ স্বপ্ন নয়—কল্পনা নয়, এ সুদিন আসিবেই আসিবে। আবার পল্লীর সন্তান পল্লীতে ফিরিয়া আসিবে, আবার নবপ্রভামণ্ডিতা নবশ্রীশোভিতা শস্যশ্যামলা পল্লীজননীর অতীত গৌরব আমরা দেখিতে পারিব। সে আশায়ই বাঁচিয়া আছি। ওরে পল্লীর সন্তান—পল্লীর বুকে ফিরিয়া এস, মায়ের স্নেহাঞ্চলে ফিরিয়া এস—মায়ের গলা জড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে মাকে ডাক। মায়ের দুঃখ দৈন্য দূর কর, তারপরে একবার মন খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাক,—মা! মা! মা! সে ডাকে গিরি বিদারিবে—ভাগীরথীর নির্ম্মল স্রোতধারার ন্যায় মায়ের স্তন্য-সুধা সন্তানকে পালন করিবে। তখন গাহিও—

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

মফঃস্বল বাসীদের সুবিধার্থে, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, ভিঃ পিঃ ডাকে ।৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত গুলি একত্র লইতে হয় বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ লইতে পারেন।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীসমাজ (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

শাশ্বত-ভিখারী (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।

সুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

রবির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নব্য বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা